নিঃসহ যৌবন

শ্রীনবগোপাল দাস

নিঃসহ যৌবন

শ্রীনবগোপাল দাস

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশকঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

বৈশাখ, ১৩৫২

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত

এই উপন্যাসের নামকরণ এবং প্রচ্ছদপটের জন্য আমি শ্রীউমা দেবীর নিকট কৃতজ্ঞ। উপন্যাসটির প্লট্ পরিকল্পনায়ও তাঁহার সাহায্য পাইয়াছি।

—লেখক

এই লেখকের

— উপন্যাস —

অনবগুণ্ঠিতা (২য় সংস্করণ)	...	৩৲
চল্‌তি পথের বাঁশী		২৲
সাগর দোলায় ঢেউ		১॥০
হে আত্ম-বিস্মৃত		১॥০

ছোট গল্প —

তাঁরা একদিন ভালবেসেছিল (২য় সংস্করণ)	১॥০
ছিন্ন পাপ্‌ড়ী	১॥০
অসমাপ্ত	১।০

*

* *

তপতীর সঙ্গে সুবিনয়ের যখন প্রথম পরিচয় হইয়াছিল তখন সে ভাবিতেই পারে নাই একদিন এক পার্টিতে যে সামান্য আলাপের সুযোগ তাহাদের ঘটিয়াছিল তাহা কালের প্রবাহে পরিণতি লাভ করিবে গভীর অনুরাগে এবং ভালবাসায়।

সুবিনয় কলিকাতার এক বে-সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিত। এম-এ পাশ করার অব্যবহিত পরেই চাকুরীটি তাহার জুটিয়া গিয়াছিল এবং যদিও বেতন অল্প, তবু অলসভাবে দিন কাটানোর পরিবর্তে কার্যকরী কিছু করার আগ্রহে সে এই অধ্যাপনার কাজটি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধাও ছিল যথেষ্ট। তাহার ইচ্ছা ছিল সে বিলাত যায়, বড় একটা ডিগ্রী নিয়া আসে, এবং সেজন্য একটা বৃত্তি জোগাড় করাও তাহার মত মেধাবী ছাত্রের পক্ষে হয়ত কঠিন হইত না, কিন্তু সে ছিল তাহার বিপত্নীক পিতার একমাত্র সন্তান। ব্রজমোহনবাবুর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না সুবিনয় সুদূর সাত-সমুদ্র-তের-নদীতে পাড়ি দেয় এবং তাঁহারই মুখ চাহিয়া সুবিনীত পুত্র তাহার মনের উচ্চাশা বিসর্জন দিয়াছিল।

ব্রজমোহনবাবু ছিলেন সেকেলে রাশভারি গোছের লোক। পিতা যাহা ভাল মনে করেন তাহাই সন্তানের করা উচিত ইহাই ছিল তাঁহার সুদৃঢ় মত এবং মনেপ্রাণে তিনি বিশ্বাস করিতেন পিতৃ আজ্ঞা মানিয়া চলিলে সন্তানের কল্যাণ বই অকল্যাণ হয় না। তাই সুবিনয় যখন তাঁহার মুখ চাহিয়া বিলাত যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করিল তখন তিনি মনে মনে সুখী হইলেও মুখে কোন প্রকার সন্তোষ প্রকাশ করিলেন না, বরং ভাবখানা দেখাইলেন যেন সুবিনয় যদি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করিত তবে সে ভবিষ্যতে অনেক লাঞ্ছনা এবং দুঃখের ভাগী হইত। সন্তানের যাহা কর্তব্য তাহা সে করিয়াছে, ইহার মধ্যে আত্মত্যাগের কোন কথাই উঠিতে পারে না।

ব্রজমোহনবাবুর এই চিন্তাধারার পরিচয় সুবিনয় পাইল যখন সে পিতাকে জানাইল যে সে কলিকাতায় অধ্যাপনার চাকুরী গ্রহণ করিয়াছে। ব্রজমোহনবাবু লিখিলেন : "যদিও চাকুরী করার তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না তবু তুমি চাকুরী গ্রহণ করিয়াছ শুনিয়া আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছি। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার অভিপ্রায়ের কথা আমি লোকমুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম এবং তুমিও বোধ হয় জানিতে পারিয়াছিলে তোমার অভিপ্রায়ে আমার আদৌ সম্মতি ছিল না। যাহা হউক, আশা করি তুমি এখন আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া তোমার নূতন কাজে সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ নিয়োগ করিবে। বিদেশে যাইতে পারিলে না বলিয়া ক্ষোভ করিও না। আমাদের দেশে যাঁহারা বড় হইয়াছেন, যথা সার্ আশুতোষ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ইঁহারা কেহই বিদেশে যান নাই, অথচ পিতামাতার আশীর্বাদে সমাজে এবং দেশে সর্বতোমুখী প্রতিষ্ঠা ইঁহারা লাভ করিয়াছিলেন। আমি স্থির নিশ্চিত জানি এবং আশা করি অন্তরে অন্তরে তুমিও স্বীকার করিবে—আমার মনের অভিপ্রায় পালন করিয়া তোমার লাভ বই ক্ষতি হইবে না।"

এখানে বলিয়া রাখা ভাল ব্রজমোহনবাবুর অর্থের কোনই অভাব ছিল না। আজকালকার দিনেও জমিদারী হইতে তাঁহার বাৎসরিক বেশ কয়েক হাজার টাকা আয় হইত, তাহা ছাড়া অর্থের চেয়েও তাঁহার বড় অভিমান ছিল আভিজাত্যের, বংশমর্যাদার।

পিতার চিঠি পাইয়া সুবিনয় হাসিল। ব্রজমোহনবাবুর অভিপ্রায় পালন করিয়া তাহার লাভ বই ক্ষতি হইল না—এতবড় কথাটা সে কিছুতেই অন্তরে অন্তরে স্বীকার করিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহার মনে এতখানি জোর ছিল না যে সে খোলাখুলি ভাবে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে। খানিকটা নিয়তির উপর দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া সে অধ্যাপনার কাজে মনোনিবেশ করিল। পিতার সঙ্গে প্রথম সংঘাতটা এইভাবে সে এড়াইল।

কিন্তু মুস্কিল হইল তপতীর সঙ্গে পরিচয়ের পর। তপতীর পিতামাতা কেহই জীবিত ছিলেন না, সে ছিল স্বাধীন, আত্মপ্রতিষ্ঠ মেয়ে।

বি-এ পাশ করার পর সে এক মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ভাবে কাজ করিতেছিল—এমন সময় সুবিনয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল।

সুবিনয় তখন সবেমাত্র চাকুরীতে ঢুকিয়াছে। পিতার সঙ্গে যে সংঘাত বাধিয়াও বাধে নাই তাহার প্রচ্ছন্ন আঘাত সে সম্পূর্ণভাবে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। মনের এই অবস্থার মধ্যে তপতীর সঙ্গে পরিচয় তাহার জীবনের গতির মোড় ফিরাইয়া দিল।

একদিনের আলাপেই সুবিনয়ের তপতীকে ভাল লাগিয়াছিল। তপতীকে সুন্দরী বলা চলে না, কিন্তু তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানিতে এমন একটি সৌকুমার্য ছিল যাহা প্রথম দৃষ্টিতে অনেককেই আকর্ষণ করে। তাহার বয়সও হইয়াছিল—সুবিনয়ের সঙ্গে তাহার বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র দুই আড়াই বৎসরের, সুবিনয় চব্বিশ বৎসরের সীমা প্রায় ছাড়াইয়া চলিয়াছে, আর তপতী মাত্র বাইশের কোঠায় পা' দিয়াছে।

মেয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সম্বন্ধে বাহির হইতে সুবিনয়ের অনেকখানি বিভীষিকা ছিল, কিন্তু তপতীর সঙ্গে পরিচয়ের পর সুবিনয় দেখিতে পাইল মেয়ে শিক্ষয়িত্রীরা সকলেই চিড়িয়াখানার অভূতপূর্ব জীব নয়, সাধারণ মেয়েদের মত তাহারাও মানুষ। ছোট ছোট মেয়েদের সাহচর্যে তপতীর চরিত্রের কমনীয়তা যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল, অন্ততঃ সুবিনয়ের কাছে ইহাই মনে হইয়াছিল। তপতীর হাসি, টুক্‌রা টুক্‌রা কথা, এক আধটুক ছোটখাট তর্কও সুবিনয়ের বুকে অননুভূতপূর্ব এক চাঞ্চল্য আনিয়া দিয়াছিল।

সপ্তাহান্তে তপতীর সঙ্গে বেড়ানো এবং তাহার পর তাহাকে নিয়া কোন রেস্তরা বা সীনেমাতে যাওয়াটা সুবিনয়ের অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ একটা কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। কয়েকদিন পরেই সুবিনয় তপতীকে নাম ধরিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছিল যদিও তপতী তাহার দিক হইতে ততখানি সাহসী হইতে পারে নাই। তাহার কথাবার্তার মধ্যে "সুবিনয়বাবু" এই সম্ভাষণটা যেন সবসময়েই প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিত।

ইহার অর্থ এই নয় যে তপতীর মনের মধ্যে কোনই আলোড়নের সৃষ্টি হয় নাই। ধীরে ধীরে তপতীও এই শান্ত, খানিকটা খেয়ালী যুবকটির

প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছিল, যদিও সে এই গভীর সত্যটি স্বীকার করিতে তখনও প্রস্তুত হয় নাই। সুবিনয়ের প্রতি তাহার আকর্ষণটা প্রধানতঃ বন্ধুত্বের আকর্ষণ, মনের কাছে এই উক্তিই সে বারবার করিতেছিল।

হয়ত এই ভাবেই তাহাদের জীবন আরও অনেকদিন চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু এক সন্ধ্যায় গঙ্গার স্নিগ্ধ হাওয়া উপভোগ করিতে করিতে লাজুক সুবিনয়ও মুখর হইয়া উঠিল।

কথাটা উঠিল অত্যন্ত সাধারণ একটা আলোচনার পরিসমাপ্তি হিসাবে। তপতী বলিতেছিল তাহার ইচ্ছা আরও কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া সে বিলাত যায়, যে দেশটা সম্পর্কে লোকমুখে এত প্রশংসা সে শুনিয়া আসিয়াছে তাহার কতখানি সত্য এবং কতখানি অতিরঞ্জন, নিজে পরখ করিয়া দেখিয়া আসে।

—শুধু এজন্যই তুমি বিলেতে যেতে চাও, তপতী?

—শুধু এজন্য নয়, তবে এটা একটা মুখ্য উদ্দেশ্য। আর গৌণ উদ্দেশ্য হচ্ছে ওদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে একটু নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়া।

—আমারও ইচ্ছে ছিল বিলেতে যাই, কিন্তু হ'লো না! যেন হতাশার সুরে সুবিনয় বলিল।

—হ'লো না কেন বল্ছেন, সুবিনয়বাবু? এখনও ত আপনি অনায়াসে যেতে পারেন! চলুন না আমার সঙ্গে, আর বছরখানেক বাদে!. খানিকটা তরলভাবে তপতী বলিল।

—তুমি যাবে তপতী, আমার সঙ্গে? তুমি আর আমি—দু'জনে?. সুবিনয়ের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

তপতী যেন বুঝিয়াও বুঝিল না। বলিল, কেন যাব না? আপনি যাবেন আমার সঙ্গে, অথবা আমি যাব আপনার সঙ্গে. এদুটো প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য ত কিছু দেখ্ছি না!

—তুমি কি কিছুই বুঝ্তে পারছ না, তপতী?...আমি—আমি যে তোমাকে বিয়ে করতে চাই!...এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সুবিনয় শঙ্কান্বিত চোখে তপতীর দিকে তাকাইল।

প্রস্তাবের আকস্মিকতায় তপতী প্রথমে একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

ততক্ষণে সুবিনয় অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করিয়া নিয়াছে। আগ্রহান্বিত কণ্ঠে সে বলিয়া চলিল, হঠাৎ এই কথাটা বলা হয়ত সঙ্গত বা শোভন হয় নি, কিন্তু আমি তোমাকে ভয়ানকভাবে ভালবেসে ফেলেছি; তপতী! মাস দুই আগে আমি হয়ত কল্পনা করতেও পারতাম না যে কোন মেয়ে আমার জীবনে এতখানি পরিবর্তন আনতে পারবে, কিন্তু এখন দেখছি আমার দৃষ্টিশক্তি কত ক্ষীণ, অসম্পূর্ণ। তোমাকে ছাড়া আমার কিছুতেই চলবে না, বিশ্বাস ক'রো।... তুমি কি আমাকে একটুও ভালবাস না, তপতী?

এ যেন নূতন এক সুবিনয়, দ্বিধামুক্ত, নির্ভীক এক যুবকের প্রেম উপহার! তপতী একটু ভাবিল।

সন্দিগ্ধস্বরে সুবিনয় প্রশ্ন করিল, তুমি কোথাও বাগ্‌দত্তা নও ত, তপতী? তা' যদি হয়ে থাকে তাহ'লে ত আমি বড্ড অন্যায় ক'রে ফেললাম!

এবার তপতী হাসিল। বলিল, আমি কোথাও বাগ্‌দত্তা নই, সুবিনয়বাবু। কিন্তু...

—কিন্তু কি?

-কিন্তু আপনার প্রস্তাবের জবাব আমি এখ্‌খুনি দিতে পারছি না, আমাকে ভাবতে হবে...

—কেন ভাবতে হবে, তপতী? তুমি ত নিজেই বলেছ তোমার অভিভাবক কেউ নেই, যা' তোমার অভিপ্রায় তার সন্তোষসাধন করতে কারো অনুমতির অপেক্ষায় তোমাকে থাকতে হয় না! তবে এ দ্বিধা কেন?

সুবিনয় যেন মরিয়া হইয়া উঠিল।

তপতী বলিল, নিজের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে যে, সুবিনয়বাবু! তাছাড়া, যদিও আপনি স্বাধীন, তবু প্রশ্ন করি, আপনার বাবা, আপনার সমাজের অনুমতি আপনাকে নিতে হবে না কি? শুধু আমার সম্মতি থাকলেই ত জিনিসটা সহজ হয়ে যাবে না!

পিতা এবং সমাজের অনুমতির কথাটা উড়াইয়া দিয়া সুবিনয় বলিল,

বাবার জন্য ভেবো না, তপতী, তাঁর সম্মতি আমি পাব। কিন্তু কোন্ সাহসে আমি বাবার কাছে প্রস্তাব পাঠাতে পারি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে অভয় না দাও? একবারটি তুমি বলো যে তোমার কোন আপত্তি নেই!

আবার সেই আগ্রহান্বিত সুর।

দৃঢ়ভাবে তপতী জবাব দিল, দু'দিন দেরি হ'লে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না, সুবিনয়বাবু। ইতিমধ্যে আপনি আপনার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে দেখুন, যদি কোনখান থেকে বাধা আসে তার বিরুদ্ধে লড়বার মত শক্তি আছে কিনা।

তপতীর কাছ হইতে চলিয়া আসিয়া সুবিনয় কেবলই ভাবিতে লাগিল তপতী কেন তাহার প্রশ্নের সহজ একটা জবাব দিল না। বারবারই তাহার মনে হইতে লাগিল, তপতী বোধ হয় তাহাকে ভালবাসে না, এবং তাই রূঢ় কথাটা মুখোমুখি না বলিয়া সে এই প্রকার কৌশলের আশ্রয় নিয়াছে। সে একবারও ভাবিযা দেখিল না তপতী যে প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছে তাহা কত গভীরভাবে সত্য। বাংলাদেশের হাজার হাজার শিক্ষিত যুবকের মত সেও যে নিতান্তই দুর্বল, দ্বিধাভীরু এবং দায়িত্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ ইহা সে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিল না। অপরাধের বোঝা তপতীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু যে দুর্নিবার আকর্ষণ সে তপতীর প্রতি অনুভব করিয়াছিল তাহা এতটুকু শিথিল হইল না। তপতীকে সে ভালবাসিয়াছে—তাহাকে চাই-ই, সমস্ত কথার মধ্যে এই কথাটাই বারবার মাথা উঁচাইয়া তাহার মনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিন দিন পরে তপতীর কাছে ছুটিয়া গেল।

সুবিনয়ের প্রস্তাব তপতীর মনের মধ্যেও একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। যদিও সে মুখে স্বীকার করে নাই তবু এই লাজুক যুবকটিকে সে নিজেরই অজ্ঞাতে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তবে তাহার

মনে যথার্থ ভয় ছিল শেষ পর্যন্ত সুবিনয় তাহার বাবার অনুমোদনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে কিনা। কারণ সুবিনয়ের যতটুকু পরিচয় পাইয়াছিল তাহাতে সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে সুবিনয় তাহার পিতার অত্যন্ত বিনীত সন্তান। তাই সে সুবিনয়কে বলিয়াছিল সে যেন তাহার মনের সঙ্গে প্রথমে বোঝাপড়া করিয়া দেখে।

তিনদিন পর সুবিনয় যখন তপতীর কাছে ছুটিয়া আসিল তখন তপতী ভাবিল সুবিনয় সর্বদিক ভাবিয়া মন স্থির করিয়াই তাহার কাছে আসিয়াছে। তাই তাহার হাতদুইটি ধরিয়া সুবিনয় যখন আবার প্রশ্ন করিল, তপতী, তিনদিন ত কেটে গেল, এবার আমার প্রস্তাবের জবাব দাও, তখন তপতী স্বীকার করিয়া ফেলিল যে সেও সুবিনয়কে ভালবাসে এবং বিবাহে তাহার কোন আপত্তি নাই।

তপতীর সম্মতিতে সুবিনয় যেন হাতে স্বর্গ পাইল। বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াই বাবার কাছে সে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিল, তপতীর সমস্ত বিবরণ দিয়া এবং তপতী তাহাকে গ্রহণ করায় সে যে কতখানি গর্বিত ও আনন্দিত বোধ করিতেছে তাহারও একটু আভাস সহ। পত্রের শেষে সে জানাইল যে মাসখানেকের মধ্যে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে এবং সে আশা করে ইহাতে তাহার বাবার কোন আপত্তি হইবে না।

সপ্তাহের মধ্যেই ব্রজমোহনবাবুর জবাব আসিল, সুবিনয়ের সুদীর্ঘ চিঠির উত্তরে সুদীর্ঘতর চিঠি। বাংলাদেশের সমাজে বিবাহটা যে ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার নয়, ইহা একটি পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, এবং যে বিবাহে পিতামাতার আশীর্বাদ নাই তাহা যে কখনও কল্যাণকর হইতে পারে না ইহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ব্রজমোহনবাবু বলিলেন, সুবিনয় নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করে তাহাতে তাঁহার বিশেষ কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি চান না যে অজ্ঞাতকুলশীলা এক শিক্ষয়িত্রীকে বিবাহ করিয়া সুবিনয় তাঁহার, নিজের এবং বংশের সম্মান নষ্ট করে। তাহা ছাড়া, তাঁহার বিশ্বাস, সুবিনয়ের এই আকর্ষণ অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং সাময়িক মোহ মাত্র, কিছুদিন অতিবাহিত হইলেই সে এই দুর্বলতা কাটাইয়া

উঠিতে পারিবে। ..তপতীর ভালবাসা সম্বন্ধে ভালমন্দ তিনি কিছুই বলিলেন না, কিন্তু প্রকারান্তরে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার আপত্তি তপতীর দারিদ্র্যের জন্য নহে, তাঁহার আপত্তি মুখ্যতঃ তাহার বংশপরিচয়ের অভাবের জন্য, এবং দ্বিতীযতঃ, তপতীর সৎকুলজাত মেযের রীতি বহির্ভূত চাকুরী করার জন্য, অর্থাৎ খৃস্টান বা খৃস্টানোপম শিক্ষয়িত্রীকে তিনি কিছুতেই পুত্রবধূরূপে ববণ করিয়া নিতে পারিবেন না।

ব্রজমোহনবাবুর এই চিঠি পাইয়া সুবিনয় স্তম্ভিত হইল। সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই তাহার পিতা বিবাহে এইপ্রকাব আপত্তি করিবেন। সে বিশেষভাবে রোষান্বিত বোধ করিল ব্রজমোহনবাবুব উল্লেখে যে তপতীর প্রতি তাহার এই আকর্ষণ একটা সাময়িক মোহ মাত্র। তপতীকে সে ভালবাসে না, কয়েকদিন অতিবাহিত হইলেই এই মোহ হাওয়ায় মিশিয়া যাইবে, এই ইঙ্গিতগুলি যেন তীব্র বিদ্রূপের মূর্তিতে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

বেশ রূঢ়ভাবেই সে ব্রজমোহনবাবুর কাছে আবার চিঠি লিখিল যে তিনি যদি মনে কবিয়া থাকেন তপতীকে বিবাহ না করিতে পারিলেই সে তাহাকে ভুলিয়া যাইতে পারিবে তবে তাহা ভুল, প্রকাণ্ড ভুল। তপতীকে যদি সে বিবাহ করিতে না পারে তবে সে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না, আজীবন সে কুমার হইযা থাকিবে, একথাটা যেন পিতা উপলব্ধি করেন। চিঠিটা সে শেষ করিল অনুনয়ের ভঙ্গীতে, ব্রজমোহনবাবু যেন পুত্রেব মুখ চাহিয়া সম্মতি দান করেন।

•

চিঠিটা লিখিয়া সে আবার আসিল তপতীর কাছে—তাহাকে জানাইতে যে পিতার এই অযৌক্তিক অসম্মতি সে কিছুতেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না।

তপতী চুপ করিয়া সব শুনিল। ব্রজমোহনবাবু সুবিনয়ের কাছে যে চিঠি লিখিয়াছেন তাহাও পড়িয়া দেখিল। তাহার পর সুবিনয়ের দিকে তাকাইয়া শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এখন কি করবে?

—কেন, তোমাকে বিয়ে করব।

—সত্যি?

তপতীর কণ্ঠ যেন একটু শ্লেষমিশ্রিত!

--তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ, তপতী? প্রয়োজন হ'লে আমি বাবার অসম্মতিকে উপেক্ষা করতে পারি এই বিশ্বাসটুকু তোমার একেবারেই নেই?

এবার তপতী বেশ শান্ত সহজস্বরে কথা বলিল।

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা বলছি না, সুবিনয়। আমার জন্য তোমার বাবার অসম্মতিকে উপেক্ষা করতে হয়ত তোমার বাধবে না, কিন্তু আমি কেন তা' হ'তে দেব? আমার সামান্য সুখের জন্য তোমার এবং তোমার বাবার মধ্যে বিচ্ছেদ আমি কিছুতেই ঘটতে দিতে পারি না!

—কিন্তু শুধু তোমার সুখের কথা উঠছে না, তপতী! আমার সুখ, আমার জীবনও যে তোমার সুখের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

—ঐখানেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না, সুবিনয়। না, আমাকে বলতে বাধা দিও না।..আমি বলছি এই—তুমি এখন ভাবছ আমাকে বিয়ে করতে না পেলে তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি অন্তরে অন্তরে জানি, তা' হবে না। এইখানে আমি তোমার বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত: আমার প্রতি তোমার এই আকর্ষণ তুমি যতখানি বড় ক'রে দেখছ আসলে এ তত বড় নয়।.. এর চেয়েও বড় হচ্ছে তোমার পরিবার, তোমার অভিজাত সমাজের প্রতি তোমার অবচেতন মনের আকর্ষণ।. বিদ্রোহীর মন নিয়ে তুমি পৃথিবীতে আস নি' বিদ্রোহ তুমি করতে পারবে না।

—তুমি আমাকে অত্যন্ত ছোট ক'রে দেখছ, তপতী!

—না, সুবিনয়, ছোট ক'রে দেখছি না। ছোট-বড়র কথাই আসছে না। তোমার শিক্ষাদীক্ষা, তোমার আদর্শ হচ্ছে একধাঁচের, আর তুমি যা' করবে ব'লে তোমার বাবাকে ভয় দেখাচ্ছ সেটা হচ্ছে অত্যন্ত অস্বাভাবিক, তোমার আদর্শের একেবারে বাইরে। অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক ক'রে তুলতে চেষ্টা ক'রো না, সুবিনয়!

অত্যন্ত আহতভাবে সুবিনয় তপতীর দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি, তপতী,

তুমি আমাকে ভালবাস না. অন্ততঃ, আমি তোমাকে যতখানি ভালবাসি ঠিক ততখানি নয়।

তপতী জবাব দিল, আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি বা না বাসি তার উত্তরের জন্য সারা জীবন ত পড়ে রইল।..আমরা মেয়েমানুষ, সুবিনয়, মুখে খুব বেশি কথা বলতে পারি না, কিন্তু জীবন দিয়ে কথা বুঝিয়ে দিতে জানি।

সুবিনয়ের গলার স্বর ভারী হইয়া আসিয়াছিল, চোখের কোণে বোধ হয় একবিন্দু অশ্রুও আসিয়া পড়িয়াছিল! তপতী তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একটু তরলকণ্ঠে বলিল, তুমি আমার জন্য ভেবো না, সুবিনয়। আমি ত এই শিক্ষয়িত্রীর কাজেই জীবন কাটাব স্থির করেছিলাম, মাঝখানে তুমি এসে একটু গোলমাল ক'রে দিলে, এখন আবার আমার পুরানো জীবনে ফিবে যাব!

—অর্থাৎ আমাকে বেমালুম ভুলে যাবে!

—ভুলে যাব না, সুবিনয়, মেয়েমানুষের জীবনে ভালবাসার অনুভূতি যদি একবার আসে তাহ'লে তার দাগ মুছে ফেলা অসম্ভব, একথাটা তুমি বিশ্বাস ক'রো। আমি তোমার তপতীই থাকব, যদি কখনও কোন প্রয়োজনে আমার কাছে আসতে ইচ্ছা করে, নিঃসঙ্কোচে চলে এসো, আমার দিক থেকে দুয়ার চিরকালের জন্য খোলাই রইল!

বিদায় নিবার সময় সুবিনয় বলিল, আমি কিন্তু এখনও আশা ছাড়ি নি', তপতী। আমার শেষ চিঠির জবাবে আমি সম্মতি পেতেও পারি বা!

ঘাড় নাড়িয়া তপতী বলিল, আমি সে ভরসা রাখি না। তোমার বাবাকে তুমি এখনও চেন নি'।

সুবিনয় চলিয়া গেলে তপতী অনেকক্ষণ বিছানায় লুটাইয়া কাঁদিল। তাহার পর অশ্রুকলঙ্কিত মুখচোখ ধুইয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

এদিকে যথাসময়ে ব্রজমোহনবাবুর দ্বিতীয় চিঠিও আসিয়া পৌঁছিল। এবার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত চিঠি : সুবিনয়ের চিঠি পাইয়া তিনি পুনরায় ভাবিয়া

দেখিয়াছেন, কিন্তু মত পরিবর্তন করার কোনই কারণ তিনি দেখিতে পান নাই। তবু যদি সুবিনয় তাঁহার উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতে চায়, সে স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারে, কিন্তু পিতার আশীর্বাদ তাহার মিলিবে না।...আর সমাজ এবং পরিবারের কাছে কোন দাবীও সে ভবিষ্যতে করিতে পারিবে না।

সুবিনয়ের অনেক দিনের বন্ধু ছিল অসীম, কলিকাতায় সে ডাক্তারি করিত। তপতীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইবার পর সে অসীমের সঙ্গ-সাহচর্য হইতে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এখন পিতার শেষ চিঠি পাইয়া সুবিনয় ছুটিল অসীমের কাছে।

অসীম তখন কল্ শেষ করিয়া মাত্র তাহার ফ্ল্যাটে ফিরিয়াছে। ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট্—তিনখানা কামরাওয়ালা—সেখানে থাকিত অসীম, তাহার ছোট-ভাই অবনী এবং তাহাদের চাকর রঘু। অসীম দিনের মধ্যে আট-দশ ঘণ্টাই কাটাইত বাহিরে, তাহার চেম্বারে এবং রোগীদের গৃহে। অবনী বি-এ পাস করিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাহার দাদার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া বসিয়া-ছিল—মাঝে মাঝে সে চাকরীর খোঁজে এদিক ওদিকে যাইত, নতুবা অসীমের ফ্ল্যাটের রক্ষণাবেক্ষণ করাই ছিল তাহার প্রধান কাজ।

দোরগোড়াতেই সুবিনয়ের ঠোকাঠুকি হইয়া গেল অবনীর সঙ্গে।

—এই যে সুবিনয়দা', আপনার দেখাই পাইনি' অনেকদিন! দাদা সেদিনও আপনার কথা বলছিলেন।

—অসীম আছে ত?...সুবিনয় প্রশ্ন করিল।

—হ্যাঁ, আছেন। এইমাত্র ফিরেছেন।

—অসীম, ওহে অসীম!...ডাকিতে ডাকিতে সুবিনয় অসীমের ঘরে প্রবেশ করিল।

—কি হে, তোর যে একেবারে দেখাই নেই! ডুমুর ফুল ব'নে গিয়েছিস্, দেখছি! তারপর, কি খবর?...অসীম প্রশ্ন করিল।

ধপ্ করিয়া অসীমের বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া সুবিনয় বলিল, অনেক কথা আছে। তোমার উপদেশের ভয়ানক দরকার।

বয়সে বৎসর দুয়েকের বড় বলিয়া অসীম সুবিনয়কে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিত, যদিও সুবিনয় অসীমকে সম্বোধন করিবার সময় এতখানি ঘনিষ্ঠতা দাবী করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত।

—উপদেশ? উপদেশ ত চিরকালই দিয়া আসছি।...বল্ তোর কি সমস্যা, দেখি আমি আমার অমূল্য অভিজ্ঞতা দিয়ে তা' সহজ সরল ক'রে দিতে পারি কি না!

—ঠাট্টা নয়, অসীম, অত্যন্ত সীরীয়স্ ব্যাপার!

—ভূমিকা না ক'রে ব'লেই ফেল্ না!.. অধীরভাবে অসীম জবাব দিল।

সুবিনয় ধীরে ধীরে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কি ভাবে তপতীর সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল, তাহার পর তাহার প্রেম-নিবেদন, তপতীর উত্তর, ব্রজমোহনবাবুর প্রথম চিঠি, তপতীর সুবিনয়-চরিত্র বিশ্লেষণ, ব্রজমোহনবাবুর শেষ চিঠি, কিছুই সে গোপন রাখিল না। কথাগুলি বলিয়া তাহার বুকটা যেন অনেকখানি হালকা হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসুনেত্রে অসীমের দিকে তাকাইল।

অসীম শুধু একটি মাত্র মন্তব্য প্রকাশ করিল

—অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে!

অসহিষ্ণুভাবে সুবিনয় বলিল, সে আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু তোমার কাছে এসেছি তপতীর প্রশংসা বা আমার নিন্দা শুনতে নয়, তোমার কাছে শুনতে চাই এরকম অবস্থায় তুমি কি করতে, অর্থাৎ তুমি আমাকে এক্ষেত্রে কি করতে বলো?

এবার বেশ গম্ভীরভাবে অসীম বলিল, বন্ধু, এসব বিষয়ে পরামর্শ কেউ দিতে পারে না, অথবা পরামর্শ দিলেও তার কোন মানে হয় না। পথ তোমাকে নিজেই বেছে নিতে হবে—আমরা, এমনকি তপতীও, তোমাকে কোন নির্দেশ দিতে পারব না—অন্ততঃ নির্দেশ দেওয়াটা উচিত হবে না!

অত্যন্ত অসহায়ভাবে সুবিনয় বলিল, কিন্তু তুমি আমার বন্ধু, আমার কল্যাণ তোমার কাম্য, তুমি আমাকে ভাল একটা সমাধান বলে দিতে পার না?

—না, পারি না, কারণ যে সমস্যা তোর সামনে আজ এসে উপস্থিত হয়েছে এর ভাল অর্থাৎ সর্বদিক-দিয়ে-বাঁচিয়ে-রাখা কোন সমাধান আছে বলে আমার মনে হয় না! হয় তপতীর সম্মান রক্ষা করতে হবে নতুবা তোর জমিদার পিতার আভিজাত্যকে বাঁচাতে হবে—কিন্তু দুটো একসঙ্গে রাখা একেবারে অসম্ভব!

তপতী যে কিছুতেই চায় না আমি আমার বাবার অমতে তাকে বিয়ে করি!

—সেটা তপতীদেবীর মহত্ব।... সংক্ষেপে অসীম জবাব দিল।

—নিজের কাছে আমি যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছি, অসীম! তপতীকে ত্যাগ করতেই হবে—বাবাকে আমি বোধ হয় অমান্য করতে পারব না, কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা পালন ক'রে যে আনন্দ ও গর্বের সঞ্চার হয় শুনেছি তা' ত আমার বুকে এতটুকুও অনুভব করছি না! তবে কি আমি একূল-ওকূল দুইই হারাতে চলেছি?

সুবিনয়ের কথার মধ্যে এমন একটা কাতরতা ফুটিয়া উঠিল যে অসীম তাহার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকাইল। অভিজ্ঞ ডাক্তারের চোখে তাহাকে পলকের মধ্যে দেখিয়া নিয়া বলিল, সুবিনয়, আমার মনে হচ্ছে তোর স্নায়ু-গুলোর উপর বড্ড চাপ পড়ছে। তোর এখন দরকার বিশ্রামের—কিছুদিন তুই কলকাতার বাইরে কোন পাহাড়ে গিয়ে ঘুরে আয়, শরীর ও মন দুইয়েই সুস্থ বোধ করবি। তারপর তোর এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাবে!

অসীমের এই নির্দেশটি সুবিনয়ের বেশ ভাল লাগিল। অন্তত কিছুদিনের জন্য ত সে এই দোটানা হইতে মুক্তি পাইবে! তপতীকে সে বলিয়া যাইবে যে পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে তাহার কার্যপদ্ধতি স্থির করিয়া ফেলিবে। আর বাবাকে সে জানাইবে যে আর কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া সে পাহাড়ে চলিয়া যাইতেছে—হয়ত সে আর ফিরিবে না! কে জানে, বাবা হয়ত ভয় পাইয়া অবশেষে সম্মতি দিয়া দিবেন!

সুবিনয় অসীমের কাছ হইতে বিদায় নিয়া তাহার বাসায় ফিরিল। সে চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অসীমের মুখ দিয়া শুধু একটি কথা বাহির হইল, হায় ভীরু!

সুবিনয় প্রথমে ভাবিল দার্জিলিং-এ যাইবে। কিন্তু খাকিপোষাক-পরিহিত লোকদের সেখানে এত ভিড় যে কোন ভাল হোটেলেই সে স্থান পাইল না। অবশেষে সে স্থির করিল সে চলিয়া যাইবে অনেক দূরে—বাংলা-দেশের বাহিরে—মুসৌরী পাহাড়ে। জায়গাটা নতুন—সেখানকার নতুন আবহাওয়ায় তাহার মনটা হয়ত সম্পূর্ণ স্নিগ্ধ ও সতেজ হইয়া ফিরিয়া আসিবে।

হোটেলের বন্দোবস্ত করিয়া টিকিট কাটিয়া সে আবার গেল তপতীর কাছে, তাহাকে জানাইতে যে দিনদশেক আগে তাহার সঙ্গে যে কথাবার্তা হইয়াছে তাহাই তাঁহার শেষ কথা নয়, মুসৌরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে একটা কিছু স্থির করিয়া ফেলিবে। ততদিন তপতী যেন অপেক্ষা করে।

কিন্তু তপতীর দেখা মিলিল না। যে হস্টেলে তপতী থাকিত তাহার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সুবিনয়কে বলিল যে সপ্তাহখানেক আগে তপতী চলিয়া গিয়াছে—একমাসের ছুটিতে। কোথায় গিয়াছে ঠিক বলিয়া যায় নাই, তবে ছোটনাগপুরের কোন সহরে হইবেও বা! না, সুবিনয়ের জন্য কোন চিঠি বা সংবাদ সে রাখিয়া যায় নাই।

বিষণ্ণচিত্তে সুবিনয় মুসৌরীর পথে রওনা হইল।

মুসৌরীতে আসিয়াই সুবিনয়ের অত্যন্ত ভাল লাগিল। দার্জিলিং-এর মত তুষারশুভ্র বিরাট গিরিশ্রেণী মুসৌরীতে দেখা যায় না সত্য, কিন্তু দার্জিলিং-এর বর্ষা এবং আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা মুসৌরীতে নাই। তাহা ছাড়া মুসৌরীর লোকদের অত্যন্ত অমায়িক ও আনন্দোচ্ছল বলিয়া সুবিনয়ের মনে হইল। নাচ, গান, পার্টির দিকে সুবিনয়ের ঝোঁক কোনদিনই ছিল না, তবু অবসর পাইলেই সে মুসৌরীর অসংখ্য রেস্তঁরা এবং নাচ-হলের কোনটিতে চলিয়া যাইত এবং এক পট্ চা বা কফি নিয়া বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত করিত।

সে আসিয়া উঠিয়াছিল কাশ্মীর হোটেলে। ম্যালের ঠিক উপরে আধা-ভারতীয় আধা-ইংরেজী কায়দায় পরিচালিত হোটেল। সেখানে বসিয়া একদিকে সে দেখিতে পাইত ডুন্ উপত্যকার সবুজ দৃশ্য—যতদূর দৃষ্টি যায় ছোট ছোট পাহাড়, সরীসৃপের মত সঞ্চারমান নদী, ধান এবং গমের ক্ষেত। আর একদিকে দেখা যাইত বৃক্ষবিরল পাহাড়ের শ্রেণী, তাহার উপর নানা রং-এর খেলা, এবং তাহার পেছনে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মেঘের সঙ্গে প্রায় বিলীয়মান তুষারমণ্ডিত শিখরের ছোট একটি শ্রেণী।

তপতীর কথা তাহার প্রায়ই মনে হইত। তপতী কোথায় আছে, কি ভাবিতেছে, কি করিতেছে তাহা কল্পনা করিতে সে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ একটি ছবি তাহার চোখের সম্মুখে কিছুতেই ভাসিয়া উঠিত না। তাহার শুধু মনে পড়িত তপতীর সঙ্গে তাহার শেষ কথোপকথন—বিষাদ-গম্ভীর, শান্ত অথচ দৃপ্ত। বারবারই তাহার মনে হইত তপতী যেন তাহার ধরাছোঁয়ার বাহিরে, তাহাকে বুঝিতে, তাহার অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সে কোনদিনই পারিবে না। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর অবসাদ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত সে বিদ্রোহ করিয়া বসে। পিতার অহেতুক বাধাদান, অযৌক্তিক উপদেশের বিরুদ্ধে সে উপস্থাপিত করে তপতীর মৌন ভালবাসা, তপতীর প্রতি তাহার কর্তব্য, নিজের প্রতি ন্যায় ব্যবহার। কিন্তু তাহার চরিত্রের মধ্যে লুক্কায়িত দুর্বলতা অচিরেই তাহাকে করিয়া তুলিত শঙ্কিত, দ্বিধাযুক্ত, নিয়তিপূজারী।

সে ভাবিয়াছিল কলিকাতা হইতে দূরে আসিয়া পাহাড়ের নির্জনতায় তাহার শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের স্থৈর্য ফিরিয়া পাইবে। স্বাস্থ্য তাহার কিয়ৎপরিমাণে ফিরিল বটে, কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব এতটুকু ঘুচিল না, কলিকাতায় সে যে দোটানার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছিল, সুদূর মুসৌরীতে বসিয়াও তাহারই প্রবাহ তাহাকে বিপর্যস্ত করিয়া চলিল।

মনের এই অবস্থায় মুসৌরীর মত স্থানেও কাহারও সঙ্গে সুবিনয়ের বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিল না। দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, সুবিনয়ের একাকী ভ্রমণ এবং একাকী সীনেমা, রেস্তঁরা এবং নাচহলে যাওয়ার প্রোগ্রাম অটুট রহিল।

সেদিন ব্রেকফাস্টের পর সুবিনয় তাহার প্রাত্যহিক ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাক রোড যেখানে কুল্‌রি বাজারের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে সেখানে রাস্তার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে পাহাড়ের নীচের সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছিল, এমন সময় তাহার নজর পড়িল নিচের ছোট্ট কটেজটির দিকে। দেখিল অত্যন্ত সুন্দরী একটি মেয়ে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে।

কটেজের পথ যেখানে ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাক রোডের কাছে আসিয়া মিশিয়াছে তাহারই অতি সন্নিকটে সুবিনয় দাঁড়াইয়াছিল। মেয়েটি রাস্তায় আসিয়া নিঃশ্বাস লইবার জন্য একটু থামিল, তাহার পর কুল্‌রি বাজারের দিকে ছুটিল।

সুবিনয় অত্যন্ত কৌতূহলী বোধ করিল। চীৎকার করিয়া বলিল, দেখুন, শুনছেন?

মেয়েটি বোধ হয শুনিতে পায় নাই, কারণ সে সমান দ্রুতগতিতে ছুটিয়াই চলিল।

হঠাৎ অদূরে কয়েকজন কুলি চীৎকাব করিয়া উঠিল, হঠ্‌ যাও, হঠ্‌ যাও!.. দুইটি ছোট ছেলে তাহাদের আযার সঙ্গে খেলা করিতেছিল, তাহারা কাঁদিয়া ফেলিল।

পলকের মধ্যে সুবিনয় দেখিল, উল্টা দিক হইতে জোরে ঘোড়া চালাইয়া একজন সাহেব আসিতেছেন এবং মেয়েটি অন্ধভাবে সেই ঘোড়ারই দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ঘোড়াটি এবং তাহার চালকও শিক্ষিত, মেয়েটির প্রায় গায়ে আসিয়া পড়াব সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া থমকাইযা দাঁড়াইল, কিন্তু টাল সামলাইতে না পারিয়া মেয়েটি প্রায় ঘোড়ার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল।

ততক্ষণে চারিদিবের কুলি এবং পথচারীদের কৌতূহল ও সহানুভূতির ফলে বেশ ছোটখাট একটা জনতা জমিযা গিয়াছে। অশ্বারোহী সাহেবটিও অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং প্রশ্ন করিতেছেন, ম্যাডাম, আপনার কোথাও লাগে নি' ত?...জনতা হইতে দুই-একজন লোক হিন্দীতে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে যে সৌখীন অশ্বা-

রোহীদের অত্যাচারে মুসৌরীতে সাধারণ লোকের থাকা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুবিনয় দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটি তখন উঠিয়া বসিয়াছে এবং অত্যন্ত লজ্জিতভাবে ইংরেজীতে সাহেবটিকে বলিতেছে, না, আমার কিছুই লাগে নি'। দোষ ত আমারই নিজের, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সাহেবটি টুপিটা স্পর্শ করিয়া মেয়েটিকে অভিবাদন করিয়া ঘোড়ায় পুনরারোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, লোকের ভিড়ও কমিয়া আসিল। কিন্তু সুবিনয় লক্ষ্য করিল, মেয়েটি যদিও বলিতেছে তাহার কিছুই লাগে নাই তবু সে যেন কেমন বিহ্বলভাবে তাকাইতেছে।

অগ্রসর হইয়া সে ইংরেজীতে বলিল, কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয় আপনার এখ্‌খুনি বাড়িতে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করা দরকার। আপনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি'!

কাতরভাবে মেয়েটি সুবিনয়ের দিকে তাকাইল। বলিল, আপনি কি কাছাকাছিই কোথাও থাকেন?

– না, তবে আমার এখন কোনই কাজ নেই, আপনাকে অনায়াসে বাড়িতে পেঁাছে দিয়ে আসতে পারব।

--কিন্তু বাড়িতে ফিরে গেলে যে চলবে না, আমাকে এখ্‌খুনি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে!... হঠাৎ বাংলাতেই কথাগুলি বলিয়া ফেলিল।

এবার সুবিনয় সাহস পাইল। বাংলাতে বলিল, দেখুন, আপনি বাঙালী, আমিও বাঙালী। বিদেশে কোনপ্রকার সংকোচ করবেন না। আপনি আমার সঙ্গে আপনার বাড়িতে চলুন, তারপর ডাক্তারের ব্যবস্থার কথা শোনা যাবে এবং সেই অনুযায়ী যা করা দরকার সেও করা যাবে।

খানিকটা যেন অনিচ্ছার সহিতই মেয়েটি সুবিনয়ের প্রস্তাবে রাজী হইল। সে অগ্রসর হইয়া চলিল তাহাদের কটেজের দিকে, কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়াই থমকাইয়া দাঁড়াইল।

সুবিনয় তাহার পশ্চাতে পশ্চাতেই আসিতেছিল। প্রশ্ন করিল, থামলেন যে?

পাণ্ডুর মুখখানা সুবিনয়ের দিকে তুলিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া মেয়েটি জবাব দিল, চলতে পারছি না, পা'টা বোধ হয় মচ্‌কে গেছে!

—দেখুন ত!...ভর্ৎসনার সুরে সুবিনয় বলিল...আর আপনি এই পা' নিয়ে যাচ্ছিলেন কোথায় ডাক্তারের খোঁজ করতে! চলুন, আমার কাঁধে হাতটা ভর করুন, খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে নামবেন কিন্তু!

সুবিনয়ের কাঁধে হাত রাখিতে যাইয়া মেয়েটির সুগৌর মুখখানি আরও রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু সে কোনপ্রকার আপত্তি না করিয়া ধীরে ধীরে পথ বাহিয়া নামিয়া গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুবিনয় রেবাদের দুরবস্থার কথা আদ্যোপান্ত শুনিল। রেবার বাবা শশিকান্তবাবু একমাত্র মেয়েকে নিয়া আসিয়াছেন মুসৌরীতে—ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদল করিতে। পশ্চিমেরই এক সহরে—মির্জাপুরে—তাঁহার বাস। সুবিনয়ের মত রেবাও মাতৃহীনা। সঙ্গে একটি চাকর ছাড়া মুসৌরীতে তাঁহাদের সঙ্গে আর কেহই নাই।

রেবাই শশিকান্তবাবুর সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছে। মুসৌরীতে আসিয়া প্রথম মাসটা শশিকান্তবাবু সুস্থ ছিলেন, কিন্তু সপ্তাহখানেক যাবৎ আবার অসোয়াস্তি বোধ করিতেছেন। আজ সকালে হঠাৎ তিনি অজ্ঞানের মত হইয়া যান, চাকর বাজারে চলিয়া গিয়াছে, বাবাকে একটু সুস্থ করিয়া রাখিয়াই রেবা ছুটিয়াছিল কুল্‌রি বাজারে—শশিকান্তবাবুকে যে ডাক্তার দেখিতেছেন তাঁহাকে খবর দিতে। তাহার মধ্যেই এইসব ঘটনা ঘটিয়া গেল।

শশিকান্তবাবু সুবিনয়ের মুখে সমস্ত কাহিনী শুনিলেন। ঈষৎ চিন্তিতকণ্ঠে বলিলেন, রেবা একটু বেশি উতলা হ'য়ে নতুন এক বিপদ ডেকে আনলে, এখন এই খোঁড়া পা' নিয়ে যে আমাদের কত লাঞ্ছনা আছে কে জানে?.. আমি ত ভালই আছি—সকালবেলাটা হঠাৎ কেন যেন মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আমি বেশ সুস্থ বোধ করছি।...আপনি আর ডাক্তারের হাঙ্গামা করবেন না, সুবিনয়বাবু।

সুবিনয় শশিকান্তবাবুকে ভরসা দিয়া বলিল, আপনি ভাববেন না, শশিকান্তবাবু।...বিদেশে বাঙালী পরিবারকে এতটুকু সাহায্য যদি না করতে

পারলাম তবে আমাদের বাঙালীত্বের বড়াই করাই বৃথা। আমি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় আপনাদের খোঁজ নেব—আমারও এখানে কোনই কাজ নেই, অলস সময়গুলো বরং কাটবে ভাল।

রেবার দিকে তাকাইয়া বলিল, আর আপনি এখন বেশি ছুটোছুটি না ক'রে সোজা শুয়ে পড়ুন দেখি! আপনাদের চাকর ফিরে এলে তাকে এখানে রেখে আমি ডাক্তারকে খবর দিতে যাব।

রেবা কি যেন প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, শশিকান্তবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, তুই সুবিনয়বাবুর কথাটা শোন্ দেখি, রেবা!

রেবা আর কোন কথা না বলিয়া সুবিনয়ের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল।

শশিকান্তবাবু বলিলেন, অসময়ে আপনি আমার ভয়ানক উপকার করলেন কিন্তু সুবিনয়বাবু! আজ আপনি না থাকলে রেবা যে কি মুস্কিলে পড়ত তা' কল্পনাই করতে পারি না!

সুবিনয় বলিতে যাইতেছিল, সে এমন আর কি করিয়াছে যাহার জন্য এতখানি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ তাহার প্রাপ্য, কিন্তু শশিকান্তবাবু তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বলিয়া চলিলেন, বাংলাদেশ ছেড়ে আমরা অনেক দিন ধরেই প্রবাসী, সুবিনয়বাবু, কাজেই বাংলাদেশের আদব-কায়দা মেনে যদি সব সময় চলতে না পারি আপনি অপরাধ নেবেন না যেন! আমি ত তবু বাংলাদেশে ত্রিশবছর কাটিয়েছি, কিন্তু আমার মেয়ে রেবা বলতে গেলে হিন্দুস্থানীই ব'নে গেছে! নিতান্ত শৈশবে একবার কলকাতায় গিয়েছিল, আমার সঙ্গে, তারপর বরাবর মির্জাপুরেই রয়েছে!... তাই এর স্বভাবের মধ্যে জড়তা নেই এতটুকুও, যা অনেক বাঙালীর কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকতে পারে!

সুবিনয় এসব কথার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। শশিকান্তবাবু বলিতে লাগিলেন, আপনি—তুমি আমার পুত্রস্থানীয়।... তোমাকে যদি সুবিনয় বলে ডাকি তাহ'লে তোমার আপত্তি হবে না ত, বাবা?

লজ্জিত কণ্ঠে সুবিনয় জবাব দিল, না, আপত্তি হবে কেন? আপনি

নিশ্চয় আমার নাম ধরে আমাকে ডাকবেন, তাতে আমি খুসীই হব।

—আঃ, বাঁচালে, বাবা! এতক্ষণ গালভরা 'সুবিনয়বাবু' বলতে বলতে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম!...বেশ যেন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শশিকান্তবাবু বলিলেন।

তাহার পর অনেকটা যেন আবদারের সুরে বলিলেন, তুমি, বাবা, কোনরকম সঙ্কোচের বালাই না রেখে যখন খুসী এখানে চলে এসো।... প্রয়োজন যদিও আমাদেরই, তবু বলে রাখছি একলা বিদেশেবিভূঁয়ে তোমারও মন হয়ত কেমন কেমন করতে পারে, আমাদের এখানে তোমার অবারিতদ্বার খোলা রইল।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ডাক্তারের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সেইদিনের মত সুবিনয় শশিকান্তবাবু ও রেবার কাছ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ক্যামেল্‌স্‌ ব্যাক রোড পর্যন্ত তাহাকে পৌঁছাইয়া দিল রেবা। বলিল, বাবার সঙ্গে ত আপনার খুব ভাব হয়ে গেছে দেখলাম—আশা করি আপনি এখন নিঃসঙ্কোচে আমাদের এখানে আসতে পারবেন।

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া সুবিনয় ভাবিতে লাগিল অদ্ভুত এই সব ঘটনা সমাবেশের কথা, এবং তাহার ফলে রেবাদের সঙ্গে তাহার এই বিচিত্র পরিচয়। ভাবিয়াছিল মুসৌরীতে বাকী দিনকয়টা নীরব একাকীত্বে কাটিয়া যাইবে, কিন্তু এখন দেখিল তাহা হইবার নয়। বোধ হয় অকারণেই মনটা একটু পুলকিত হইয়া উঠিল।

ওদিকে শশিকান্তবাবু ও সুবিনয়ের সঙ্গে এই অদ্ভুতভাবে পরিচয় হওয়ার কথাটা নিয়া মনের মধ্যে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন। যে দুরন্ত ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার কবল হইতে মুক্তি যে তিনি পাইবেন না ইহা তিনি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন—ডাক্তারের নানাপ্রকার আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও। তাঁহার প্রার্থনা ছিল মাত্র

দুইটি—প্রথম, মৃত্যু যেন সহজ হয়, সুদীর্ঘকাল যেন তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে না হয়। দ্বিতীয়, মৃত্যুর পূর্বে রেবাকে যেন উপযুক্ত এক স্বামীর হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারেন।

এই দ্বিতীয় প্রার্থনাটি সফল হইবার কোনই সম্ভাবনা তিনি এতদিন দেখিতে পান নাই। কারণ তাঁহার অর্থের সামর্থ্য ছিল না, তাহা ছাড়া বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার ফলে বন্ধুবান্ধবেরাও তাঁহার কাছ হইতে অনেকখানি দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। মুসৌরী আসার পর অবধি কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, রেবার কোন একটা ব্যবস্থা বোধ হয় তিনি করিয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অত্যন্ত আদরিণী মেয়েকে বুঝি বা পথে দাঁড়াইতে হয়।

সেদিন যে তিনি কিছুকালের জন্য অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার পিছনেও ছিল এই দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যতের এই বিভীষিকার ছায়া।

কিন্তু সুবিনয়ের সঙ্গে পরিচয়ের মুহূর্ত হইতেই তিনি যেন আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখিতে পাইলেন। সুবিনয় অবিবাহিত, সুবিনয় কলিকাতায় এক কলেজে চাকুরী করে, মোটের উপর সে সুদর্শন, তাহা ছাড়া জাতিকুলের দিক দিয়াও কোনপ্রকার বাধা হইবে না, এই সমস্তই শশিকান্তবাবুর কাছে মনে হইতে লাগিল ভগবানের বিচিত্র বিধান। সুবিনয় চলিয়া যাইবার পরমুহূর্ত হইতেই তিনি নানাপ্রকার আকাশকুসুম কল্পনা করিতে লাগিলেন।

রেবা পিতার মনের এই অভিলাষ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও এটুকু বুঝিল যে সুবিনয়কে শশিকান্তবাবুর অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে—ভাবী জামাতা হিসাবে না হইলেও ভাবী বান্ধব হিসাবে। তাই সুবিনয়কে বিদায় দেওয়ার সময় সে নিঃসংকোচে দাবী জানাইয়াছিল সুবিনয় যেন তাহাদের কাছে আসিতে দ্বিধা না করে।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সুবিনয় শশিকান্তবাবুদের গৃহে একজন পরম বন্ধুর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বসিল। রেবা অতি সহজেই সুবিনয়কে আপনার করিয়া নিল। দুইদিনের মধ্যেই সুবিনয়বাবু হইয়া উঠিলেন সুবিনয়দা'।

সুবিনয়ও যথার্থ সম্প্রীতির সহিত শশিকান্তবাবুদের গৃহে আনাগোনা করিতে সুরু করিয়াছিল। শশিকান্তবাবুর দুঃস্থ অসহায় অবস্থার মধ্যে সে যে খানিকটা অন্ততঃ সহানুভূতির প্রলেপ দিতে পারিতেছে ইহাতে সে অননুভূতপূর্ব এক আত্মপ্রসাদ বোধ করিতেছিল। তাহা ছাড়া সপ্তদশী রেবাকেও সে তাহার ছোট বোনটির মত স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

এই সব দেখিয়া শশিকান্তবাবু অনেকখানি আশান্বিত বোধ করিতে লাগিলেন। সুবিনয়ের সঙ্গে রেবার বিবাহ তাঁহার কাছে অত্যন্ত সহজ এবং সম্ভব একটা ব্যাপার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বাধা যাহাতে আরও কমিয়া যায় এই অভিপ্রায়ে তিনি কথাকৌশলে রেবাকে জানাইয়া দিলেন সুবিনয়কে জামাতারূপে পাইতে তিনি চাহেন এবং এই চাওয়াটা কোন নিদারুণ স্পর্ধাও নয়।

শশিকান্তবাবু মাঝখান হইতে এই গোলযোগের সৃষ্টি না করিলে কি ঘটিত, বলা কঠিন, কিন্তু তাঁহার এই স্পষ্ট নির্দেশের ফল হইল এই যে রেবা অচিরেই সুবিনয়কে তাহার ভাবী স্বামীরূপে কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল।

অবশ্য এজন্য রেবাকেও দোষ দেওয়া যায় না। শৈশবে দশবৎসর বয়সে মাকে হারাইবার পর অবধি এক পিতা ছাড়া অন্য কোন পুরুষের স্নেহ ত দূরের কথা, সঙ্গ বা সাহচর্য অবধি কখনও পায় নাই। তাহার পর তাহার যখন পনর বৎসর বয়স তখন পাকস্থলীর কি এক অসুখে তাহার পিতা শশিকান্তবাবু শয্যাগ্রহণ করিলেন। এই সতর বৎসর বয়স অবধি সে হাসিমুখে অক্লান্তভাবে পিতার পরিচর্যা করিয়া আসিযাছে, বাহিরের জগতেব সঙ্গে, কোন তরুণের সঙ্গে, এতটুকু পরিচিত হইবার সুযোগ সে পায় নাই। তাই যখন সুদর্শন অবিবাহিত অথচ বিবাহযোগ্য সুবিনয় তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতাও তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন যে সুবিনয়ই তাহার ভাবী স্বামী, তখন তাহার প্রেমে পড়িতে রেবার বিশেষ দেরি হইল না।

তাহা ছাড়া, মাত্র সতেরো বছরের মেয়ে সে—কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে সবেমাত্র আসিয়া পেঁাছিয়াছে। পৃথিবীর জটিলতা কুটিলতা,

তাহার পঙ্কিল আবর্তের সঙ্গে তাহার পরিচয়ই বা কতটুকু! সুবিনয় যে তাহাকে স্নেহ করে তাহা সে বুঝিয়াছিল এবং এই স্নেহকেই সে প্রেমের এক অভিব্যক্তি ভাবিয়া দ্বিগুণ কৃতজ্ঞতায় তাহাকে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল।

সুবিনয় কিন্তু রেবার মনের এই খেলা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিতেই পারে নাই শশিকান্তবাবু মনে মনে তাহাকেই ভাবী জামাতারূপে কল্পনা করিতেছেন। তপতীর বিষয় নিয়া তাহার মনটা একটু আগেই এত ক্ষতবিক্ষত হইয়া ছিল যে তপতীর স্থানে রেবার মত কিশোরীকে বসাইবার সম্ভাবনা যদি বা কেহ উল্লেখ করিত, তবে তাহা তাহার কাছে অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

এদিকে কথাপ্রসঙ্গে শশিকান্তবাবু জানিযা ফেলিলেন সুবিনয়ের পিতা ব্রজমোহনবাবু তাঁহারই বাল্যবন্ধু। তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির করিলেন অবিলম্বে ব্রজমোহনবাবুর কাছে চিঠি লিখিবেন, সুবিনযের সঙ্গে রেবার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া। ব্রজমোহনবাবুর সম্মতি পাইলে সুবিনয়ের কাছে কথাটা পাড়িবেন এই হইল তাঁহার প্ল্যান্।

এই অভিসন্ধির কথা সুবিনয বা রেবা কাহাকেও তিনি বলিলেন না। সুবিনযের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের মাসখানেকের মধ্যেই ব্রজমোহনবাবুর কাছে চিঠি গেল—বাল্যবন্ধুত্বের দাবী জানাইয়া বিবাহের প্রস্তাবসহ।

এদিকে সরলবিশ্বাসে সুবিনয় যথারীতি শশিকান্তবাবুর বাড়িতে আনাগোনা করিতে লাগিল।

মুসৌরীতে আসিয়াই সুবিনয় বাবার কাছে চিঠি লিখিয়াছিল। অত্যন্ত অভিমান ভরা চিঠি। বাবা কেবল অন্ধ সংস্কারের মোহে তপতীর সহিত তাহার বিবাহে আপত্তি করিলেন এবং ইহার ফলে তাহার ভবিষ্যৎ-

জীবন যে অত্যন্ত নিরর্থক ও আশাশূন্য বলিয়া মনে হইতেছে, হয়ত সে কলিকাতায় একেবারেই ফিরিবে না, এইসব কথাই সুবিনয় তাহার চিঠিতে বহন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

চিঠিখানা পাইয়া, বিশেষ করিয়া খামের উপর মুসৌরীর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া, ক্ষণেকের জন্য ব্রজমোহনবাবু বোধ হয় বিচলিত বোধ করিলেন, কারণ আলবোলার নলটা তাঁহার মুখ হইতে খসিয়া পড়িল এবং নিজেরই অজ্ঞাতেই তিনি হাঁকিলেন, নায়েবমশায়!

বৃদ্ধ নায়েব বিপ্রদাস কাছেই বসিয়া সেরেস্তার হিসাবপত্র দেখিতেছিলেন, কর্তামহাশয়ের হাঁক শুনিয়া শশব্যস্তে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

—খোকাবাবুর চিঠি, পড়ে দেখুন! ব্রজমোহনবাবু চিঠিখানা নায়েবের সম্মুখে তুলিযা ধরিলেন।

নায়েব চিঠিখানা আদ্যন্ত পড়িলেন। আগের চিঠিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ কর্তামহাশযের কাছে তিনি পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, তাই তাঁহার মুখেও চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

—আজকালকার ছেলেদেব আস্পর্ধা দেখছেন ত! চূণ থেকে পান খসেছে, অমনি ভয় দেখানো, বিবাগী হ'য়ে যাবো! বিবাগী হ'য়ে যাওয়া যেন এতই সহজ!

—কিন্তু, কর্তাবাবু, এবার খোকাবাবুব মতলবটা যেন একটু কেমন কেমন ঠেকছে!..খানিকটা ভয়ে ভয়েই নায়েব বলিলেন।

—হ্যাঁ, আপনাব ত সব সময় ভয় লেগেই আছে! আমি ব্রজমোহনবাবু আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে লোক সায়েস্তা ক'রে থাচ্ছি, নিজের ছেলের হুমকিতে ভয় খাব!...দেখা যাক কতদিন বিবাগী হ'য়ে থাকে...

বলিয়াই যেন আপন মনে বলিলেন, আমাব ভুল হয়ে গেছে ওকে চাকুরী নিতে দেওয়ায়। ওর বিলেত যাবার মতলব যখন ভেস্তে গেল তখনই উচিত ছিল ওকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং জমিদারীর কাজে বসিয়ে দেওয়া। এখন নিজে স্বাধীন চাকুরী করছে আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মিশছে যতসব খেস্টান ধিঙ্গি মেয়েদের সাথে।...ওরা যাদু জানে, নইলে সুবিনয়ের মত সুবোধ ছেলে কিনা বাপের মাথার উপর লাঠি বাগিয়ে বলে, যদি আপনি

আমাকে এখানে বিয়ে করতে না দেবেন তাহ'লে আমি যেখানে খুসী চলে যাব, বিবাগী হ'য়ে বেরিয়ে যাব।

নায়েব বিপ্রদাস সংকুচিতভাবে বলিলেন, খোকাবাবু আমাকে খুব ভালবাসেন, আমার কথাও খুব শোনেন, যদি হুকুম করেন আমি নিজে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বোঝাতে পারি!...

ব্রজমোহনবাবু খানিকক্ষণ ভাবিলেন। পরে বলিলেন, আপনি আর কি বোঝাবেন, নায়েবমশায়! আমার কথা যে শোনে না সে কি আপনার কথায় কাণ দেবে বেশি?...মিছিমিছি পণ্ডশ্রম হবে!

আদেশের অপেক্ষায় বিপ্রদাস দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্রজমোহনবাবু বলিলেন, আচ্ছা, কয়টা দিন যাক...দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

ব্রজমোহনবাবু স্থির করিলেন, এবার পুত্রের চিঠির কোন জবাব দিবেন না।

সুবিনয়ের চিঠির কোন জবাব দিলেন না সত্য, কিন্তু নানাবিধ দুশ্চিন্তার হাত হইতে ব্রজমোহনবাবু মুক্তি পাইলেন না। বারবারই তাঁহার মনে হইতে লাগিল সুবিনয়ের গর্ভধারিণী বাঁচিয়া নাই বলিয়াই সুবিনয় আজ এতখানি স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে সাহস পাইয়াছে। মাঝে মাঝে তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল এই তপতী নাম্নী মেয়েটির দ্বারস্থ হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করেন সে কেন তাঁহার একমাত্র পুত্রকে তাঁহার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে? পৃথিবীতে এক সুবিনয় ছাড়া কি তাহার আর কোন ভালবাসার পাত্র জুটিল না?...আবার পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইতে লাগিল বুঝিবা তিনি অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন, সুবিনয়কে কাছে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সব কথা সহানুভূতির সহিত শুনিলেই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ করা হইবে!

তাঁহার মন যখন এই প্রকার সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান তখন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে শশিকান্তবাবুর চিঠি আসিয়া হাতে পৌঁছিল।

শশিকান্ত? গ্রামের স্কুলের সহপাঠী শশিকান্ত ভট্টাচার্য, যাহার স্মৃতি

ব্রজমোহনের কাছে লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল? সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পূর্বে কথা—গরীবের ছেলে শশিকান্তের সঙ্গে ধনী জমিদারের সন্তান ব্রজমোহনের কি ভাবটাই না ছিল! স্কুলে তাহারা প্রতিযোগিতা করিয়া প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিযা আসিয়াছে, কিন্তু তাহাদের বন্ধুত্ব তাহাতে এতটুকুও ব্যাহত হয নাই। তারপর এন্ট্রান্স পরীক্ষায প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইযা একটি বৃত্তি পাইযা শশিকান্ত চলিয়া গেল কলিকাতায়, আব ব্রজমোহনবাবুর পিতা সন্তানকে বসাইলেন জমিদারী দেখাশোনাব কাজে। সেই অবধি শশিকান্তেব কোন খবরই ব্রজমোহনবাবু পান নাই।

শশিকান্তবাবু অত্যন্ত সঙ্কোচেব সহিত চিঠিখানা লিখিযাছিলেন। ব্রজমোহন গরীব বাল্যবন্ধুকে মনে বাখিযাছেন এমন ভবসা কবেন না, তবে নিতান্তই বিপদে পড়িযা আজ তিনি বন্ধুব শবণাপন্ন হইযাছেন। নিজেব ঔদার্যে ব্রজমোহন যদি শশিকান্তকে একটু সাহায্য কবেন তবে তিনি একটু শান্তিতে মরিতে পারেন। তাঁহাব একমাত্র কন্যা রেবাকে—সুন্দবী, স্কুলে ম্যাট্রিক অবধি পডিযাছে, গৃহস্থালী-কাজকর্ম মোটামুটি ভালভাবেই জানে—ব্রজমোহন পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবেন কি? যতদূর মনে হয় তাঁহার পুত্র সুবিনয় রেবাকে পছন্দ কবে, কিন্তু ঘোড়াকে ডিঙাইযা শশিকান্ত ঘাস খাইতে চান না, তাই সুবিনযের কাছে কোন প্রশ্ন করার পূর্বে তিনি ব্রজমোহনবাবুর কাছেই আবেদনটি পেশ করিয়াছেন, আবেদন যদি মঞ্জুর হয় তবে তিনি যথারীতি সুবিনয়ের কাছেও বলিবেন, কাবণ আজকালকাব শিক্ষায দীক্ষিত যুবক হয়ত এটুকু আশা করে যে বিবাহের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাহার নিজের সম্মতিটাও গ্রহণ করা দরকার।

নায়েব মহাশয়কে ডাকিয়া ব্রজমোহনবাবু এই নূতন ঘটনাসমাবেশের কথা জানাইলেন। বলিলেন, শশিকান্তের বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পায় নি' দেখছি।. বিয়ের কথাটা যে বাপের কাছেই প্রথমে পাড়তে হয় এটা তার জানা আছে।. .আপনি কি বলেন, নায়েবমশায়?

হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বিপ্রদাস বলিলেন, আজ্ঞে, আমি আর কি বলব? আপনি যা ভাল করেন...

প্রকাণ্ড একটা ধমক দিয়া ব্রজমোহনবাবু বলিলেন, উপদেশ চাইলে উপদেশ পর্যন্ত আপনি দিতে পারেন না... ক'বছর ধরে নায়েবি করছেন আপনি?

—আজ্ঞে, তা' বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ ত খুব হবে...

—অথচ ঘটে এতটুকু বুদ্ধি হয় নি'!... রাগে গজ গজ করিতে করিতে ব্রজমোহনবাবু বলিয়া চলিলেন...দেখতে পাচ্ছেন না এবার সুবিনয়কে বাঁধবার খুব সুন্দর সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে' ওর সেই খেস্টানি মেয়ের মোহ এতদিনে বোধ হয় ঘুচে গেছে!

ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বিপ্রদাস বলিলেন, নিশ্চয়ই!...

—নিশ্চয়ই না আপনার মাথা আর মুণ্ডু।... আমি বলছি, বোধ হয়, আর উনি বলছেন, নিশ্চয়ই!

ভর্ৎসনাটা হজম করিয়া বিপ্রদাস নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—যান্, আপনি মুসৌরী যাবার জন্য তৈরী হোন্।...আমি নিজে যেতে পারব না, আর সেটা ভালও দেখাবে না, কিন্তু আপনি গিয়ে শশিকান্তকে ব'লে আসবেন এ বিয়েতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। আর যত শীগ্‌গীর, বিয়েটা শেষ হ'য়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থাও আপনি ক'রে আসবেন।

একটু ভয়ে ভয়ে বিপ্রদাস প্রশ্ন করিল, কিন্তু খোকাবাবু যদি আপত্তি করেন?

একটা হুঙ্কার দিয়া ব্রজমোহনবাবু জবাব দিলেন, আপত্তি? আপত্তি সে করবে না, আপনি তাকে আপত্তি করবার ফুরসৎ পর্যন্ত দেবেন না!... তাহার পর একটু নরমসুরে বলিলেন, আর নিতান্তই যদি সে আপত্তি করে, আপনি টেলিগ্রাম ক'রে দেবেন, আমি নিজে গিয়ে দেখব আমার বাল্যবন্ধুর অনুরোধ সে উপেক্ষা করে কোন্ সাহসে।

একটু পরেই ব্রজমোহনবাবু মুসৌরীতে বন্ধুর কাছে তার পাঠাইয়া দিলেন যে এই বিবাহে তাঁহার সম্পূর্ণ মত আছে এবং এসম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থা করিতে তাঁহার নায়েব শীঘ্রই মুসৌরী রওনা হইতেছে।

তারটা পাঠাইয়া দিয়া ব্রজমোহনবাবু একটি আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিলেন। অদৃষ্টদেবতা যে চিরদিনই তাঁহার সহায় ইহার এই নূতন

নিদর্শন দেখিয়া আজ অনেকদিন পরে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিলেন।

দ্বিপ্রহরের খাওয়া-দাওয়ার পর শশিকান্তবাবু সুবিনয়ের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, পাশে ছিল রেবা। সুবিনয় সেদিন শশিকান্তবাবুদের ওখানেই আহারাদি সমাধা করিয়াছিল।

শশিকান্তবাবু বলিতেছিলেন তাঁহার বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের কাহিনী। ব্রজমোহনবাবুর সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম, বি-এ পাস করার পর পশ্চিমে চলিয়া আসা, বিবাহ, আবার সংগ্রাম, রেবার জন্ম, রেবার মায়ের মৃত্যু, ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার স্বরটা ভারী হইয়া আসিতেছিল এবং কোমলচিত্ত সুবিনয়ও কেমন যেন দ্রবীভূত বোধ করিতেছিল। রেবা নতমুখে নীরবে বসিয়া ছিল।

—আমার দিন ত শেষ হ'য়ে এল, সুবিনয়, এখন মেয়েটাকে সুপাত্রে দিয়ে যেতে পারলেই বাঁচি।

সুবিনয় লক্ষ্য করিল রেবার মুখ সরমে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

শশিকান্তবাবু বলিয়া চলিলেন, কি শুভক্ষণেই তোমার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, সুবিনয়, যার জন্য ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না! আজ যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয়, তুমি অন্ততঃ রেবাকে দেখবে এ ভরসাটুকু আমি বোধ হয় করতে পারি।

সরলভাবে সুবিনয় বলিল, নিশ্চয়, কাকাবাবু, আমি থাকতে রেবার কোনই অসুবিধা হবে না! আপনি নিশ্চিন্ত হোন্। কি বল রেবা, তাই নয় কি?

লজ্জায়, পুলকে রেবার কর্ণমূল টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিয়াছিল। সে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ..

পরিহাস করিয়া সুবিনয় বলিল, রেবার লজ্জা দেখুন না, কাকাবাবু,

বিয়ের কথা বললে চোখে-মুখে পথ দেখতে পায় না যেন! আমি ভাবি, বিয়ের কথাতেই এতখানি, আর সজীব বরটি যখন কাছে এসে দাঁড়াবে তখন রেবা বোধ হয় আনন্দে মূর্চ্ছা যাবে!

ঠিক এই সময় বাহিরে টেলিগ্রাফ পিয়ন হাঁকিল, তার হ্যায়, বাবু...

তার? তার আবার কে পাঠাইল? রেবা শশব্যস্তে বাহিরে যাইয়া রসিদ দিয়া তারটি গ্রহণ করিল।

—বাবা, তোমার নামে তার এসেছে, খুল্‌ব?

—খোল্‌ ত, মা।

তারটি খুলিয়া রেবা প্রথমে নীরবে পড়িল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। কে এক ব্রজ লিখিযাছে, আমার কোনই আপত্তি নাই, আমার নায়েব শীঘ্রই মুসৌরী রওনা হইতেছে, পেঁৗছিযাই সে তোমার সঙ্গে দেখা করিবে।

—বুঝলাম না, বাবা। এই নাও।. বলিয়া তারটি রেবা শশিকান্ত-বাবুর হাতে দিল।

পড়িয়াই শশিকান্তের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, মা, রেবা, তুমি একটু বাইরে যাও ত, সুবিনয়ের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ কথা আছে।

বেবা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুবিনযেব দিকে তাকাইযা শশিকান্তবাবু বলিলেন, বাবা, সুবিনয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই আমি তোমার বাবার কাছে চিঠি লিখেছিলাম—শৈশবের বন্ধুত্বের দাবী জানিয়ে। সে কত বছর আগেকার কথা, আমার বড় ভয় ছিল আমার কথা সে কি ভাবে গ্রহণ কর্‌বে। এখন দেখ্‌ছি সে এতটুকু বদ্‌লায় নি—সেই আগেকার সরল বন্ধুবৎসল ব্রজই রয়েছে।...এই দেখ আমার চিঠির জবাবে সে কি লিখেছে।

তারটি পড়িয়া সুবিনয় ভ্রূকুঞ্চন করিল। কিছুই বুঝিতে পারিল না।

আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে শশিকান্তবাবু বলিতে লাগিলেন, তোমার বাবার সম্মতি ত পাওয়া গেল, এখন আশা করি তোমার দিক থেকে কোন বাধা হবে না! কি বল, সুবিনয়?...উন্মুখভাবে শশিকান্তবাবু সুবিনয়ের দিকে তাকাইলেন।

—আপনি কি বলছেন আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, কাকাবাবু!...শঙ্কিতভাবে সুবিনয় জবাব দিল।

—কি আর বলব, বাবা? আমার রেবা-মায়ের কথা। তুমি রেবাকে পছন্দ কর তা' আমার অসুস্থ চোখকে এড়ায় নি', আর রেবাও তোমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে।...আমি জানি রেবাকে গ্রহণ ক'রে তুমি অসুখী হবে না!

আকস্মিক বজ্রপাত হইলেও সুবিনয় বোধ হয় এতখানি চম্‌কাইয়া উঠিত না। এ যে তাহার কল্পনারও বহির্ভূত! রেবার সঙ্গে তাহার বিবাহ—শশিকান্তবাবু এ কি বলিতেছেন? তাহার অজ্ঞাতে তিনি এবং ব্রজমোহন-বাবু এ কি ষড়যন্ত্র ফাঁদিয়া বসিয়াছেন?

মুহূর্তের মধ্যে সুবিনয়ের মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। সরল বিশ্বাসে, সহানুভূতিতে গলিয়া সে শশিকান্তবাবু এবং রেবার তত্ত্বাবধান করিতেছে, প্রয়োজন হইলে রেবার ভার পর্যন্ত নিতে সে রাজী হইয়াছে, কিন্তু রেবাকে সে বিবাহ করিবে একথা ত সে কখনও বলে নাই!

রেবাকে সে পছন্দ করে সত্য, কিন্তু ভাবী-স্ত্রী বা প্রেমিকা হিসাবে নয়, নিতান্ত ছোট বোনটির মত।...তপতীর কথা তাহার মন হইতে এতটুকু মুছিয়া যায় নাই, সে এখনও আশান্বিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে বাবা হয়ত বা অবশেষে তপতীর সঙ্গে তাহার বিবাহে সম্মতি দিবেন, ইহার মধ্যে এ কি অনাবশ্যক বাহুল্যের সৃষ্টি!

বেশ একটু বিরক্তভাবেই সুবিনয় জবাব দিল, রেবাকে আমি বিয়ে করতে রাজী আছি একথা আপনাকে কে বল্‌ল, কাকাবাবু?...রেবার সঙ্গে আমার বিঁয়ে অসম্ভব—আপনি স্থির জেনে রাখুন।

ভীত অসহায়ভাবে শশিকান্তবাবু বলিলেন, তুমি রাগ ক'রো না, সুবিনয়। তোমাকে আগে না-বলাটা বোধ হয় আমার অন্যায় হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার বাবার সম্মতি না পেলে আমি এই দুঃসাহসের কথাটা বলিই বা কি ক'রে?...তুমি অত্যন্ত দয়ালু, মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের শেষ দিন কয়টা একটু আনন্দে ভ'রে দিতে যদি পার ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করবেন!

বলিয়া শশিকান্তবাবু হাঁপাইতে লাগিলেন।

তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সুবিনয় দুঃখিত ও লজ্জিত বোধ করিল।

প্রত্যাখ্যানটাকে একটু মোলায়েম করিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, আমি রেবার ভার নিয়েছি, যাতে সুপাত্রে তার বিয়ে হয় সে দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, কাকাবাবু, কিন্তু আমার সঙ্গে তার বিয়ে অসম্ভব—সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শেষের কথাগুলি সুবিনয় বেশ দৃঢ়ভাবেই বলিল।

—কিন্তু অসম্ভব কেন, বাবা?...রেবাকে কি তোমার পছন্দ হয় না?

—পছন্দ অপছন্দের কথা মোটেই উঠছে না, কাকাবাবু।...আমি রেবাকে বিয়ে করতে অপারগ, আমাকে ক্ষমা করবেন!

হতবুদ্ধির মত শশিকান্তবাবু বলিলেন, তাহ'লে রেবার কি উপায় হবে?

—মানে?

—রেবা যে তোমাকে ভয়ানক ভাবে ভালবাসে, সুবিনয়।...সে যদি শুনতে পায় যে তুমি তাকে বিয়ে করবে না তাহ'লে সে—সে যে অদ্ভুত একটা কিছু ক'রে বসবে!

—ওটা আপনার মনের ভুল, রেবা আমাকে দাদার মত শ্রদ্ধা করে মাত্র ..

—আমার মনের ভুল নয়, সুবিনয়, তোমার চোখের ভুল। আজ যখন আমরা কথাবার্তা বলছিলাম, তখন মাঝে মাঝে তার মুখ কেমন লাল হয়ে উঠছিল তুমি দেখ নি'?...মা মারা যাবার পর অবধি রেবাকে আমি মানুষ করেছি, ওর নাড়ীনক্ষত্রের খবর আমি জানি!

সুবিনয় হাসিয়া আশ্বাস দিবার ভঙ্গীতে বলিল, আপনি ভাববেন না, কাকাবাবু, ওর পাগ্‌লামি আমি দু'দিনেই ঘুচিয়ে দিতে পারব।

বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সুবিনয় পলাইল।

ঘরে ঢুকিয়া রেবা দেখিল তাহার বাবা চক্ষু বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিয়াছেন, মুখখানা যেন অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর। ভীতভাবে সে ডাকিল, বাবা...

ক্লান্ত অসহায় চোখ দুইটি খুলিয়া শশিকান্তবাবু বলিলেন, কে, রেবা?

—হ্যাঁ, আমি, বাবা।

—আয়, বোস্।

রেবা পিতার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাইয়া রহিল।

—টেলিগ্রামটা এসেছে সুবিনয়ের বাবার কাছ থেকে। তোর সঙ্গে সুবিনয়ের বিয়ের প্রস্তাব ক'রে আমি চিঠি লিখেছিলাম, তারই জবাব।

এতক্ষণে রেবা টেলিগ্রামটার তাৎপর্য বুঝিতে পারিল! পুলকোজ্জ্বল মুখখানা সে পিতার বুকের উপর রাখিল।

—কিন্তু সুবিনয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পাবলাম না, রেবা।. .সে বলে এ বিয়ে হ'তে পারে না, অথচ কারণ কিছুই বল্‌লে না!

রেবার বুকের রক্ত হঠাৎ যেন অত্যন্ত দ্রুততালে চলিতে আরম্ভ করিল।

শশিকান্তবাবু বলিয়া চলিলেন, এদিকে সে বলছে তোর সমস্ত ভার সে নেবে, কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই কেমন অন্যরকম হ'য়ে যায়!

তা'রপর সস্নেহে রেবার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার এমন সুন্দরী মেয়েকে সে আদর ক'রে ঘরে নেবে এই আশাই আমার ছিল—বরং ভয় ছিল ব্রজমোহনেব সম্বন্ধে। এখন দেখছি...

অস্ফুটকণ্ঠে রেবা বলিল, তুমি আমাকে বিদেয় করতে পারলেই বুঝি নিশ্চিন্ত হও, বাবা? কেন তুমি ওঁর কাছে এ বিয়ের প্রস্তাব করলে? এখন আমি যে লজ্জায়, অপমানে মুখও দেখাতে পারব না!

এই প্রথম রেবা সুবিনয় সম্পর্কে উল্লেখ করিল নামহীন সম্বোধনে।

অনেকটা আত্মগত ভাবেই যেন শশিকান্তবাবু বলিলেন, না, না, হঠাৎ প্রস্তাবটা শুনে সুবিনয় বোধ হয় অবাক হয়ে গেছে, নইলে আমার রেবাকে বিয়ে করতে তার কি আপত্তি হ'তে পারে, বিশেষ ক'রে যেখানে তার বাবার সম্পূর্ণ মত আছে!...হয়ত একটু অভিমান হয়েছে, আমি তার মতটা আগে না নিয়ে তার বাবার কাছে কেন লিখ্‌লাম তাই ভেবে। আজকালকার ছেলে ত, মনে করে বিয়েতে সেই হচ্ছে মুখ্য, আর সবাই হচ্ছে গৌণ...

নিজের হোটেলে পৌঁছিয়া সুবিনয় ভাবিতে সুরু করিল। একটা সমস্যা সমাধান হইতে না হইতেই এ আবার কি বিড়ম্বনা! তপতীকে বিবাহ করা হয়ত অবশেষে হইয়া উঠিবে না, কিন্তু তপতীর পরিবর্তে রেবাকে বিবাহ করা—না, না, এ যে অত্যন্ত হাস্যকর একটা প্রস্তাব। তপতীকে সে ভালবাসে, রেবাকে সে এতটুকুও ভালবাসে না। রেবার প্রতি তাহার যে অনুরাগ তাহা নিছক স্নেহসম্ভূত, ঐটুকু মেয়েকে তাহার প্রিয়ার আসনে বসাইবার কল্পনাও যে অত্যন্ত অদ্ভুত প্রহসনের মত মনে হয়!

এ সমস্তই তাহার বাবা ব্রজমোহনবাবুর ষড়যন্ত্র। তাহার শেষ চিঠির জবাব তিনি দেন নাই, না দিয়া এই মতলব আঁটিয়াছেন যে সুবিনয়ের সম্মুখে অন্য কোন মেয়েকে উপস্থাপিত করিয়া দিয়া তিনি তাহার মনের গতির মোড়টা ফিরাইয়া দিবেন। কে জানে শশিকান্তবাবুর এই মুসৌরী আসা ব্রজমোহনবাবুর প্ররোচনায়ই হইয়াছে কি না।

পরক্ষণেই সুবিনয়ের খেয়াল হইল শশিকান্তবাবুরা ত গায়ে পড়িয়া সুবিনয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে আসেন নাই। বরং সুবিনয়ই নিজে যাচিয়া তাহাদের নিকট আসিয়াছে। এবং তাহাদের পরস্পরের পরিচয়ও হইয়াছে অনেকখানি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে। ইহার মধ্যে ষড়যন্ত্রের কোন নিদর্শনই যে নাই।

সে যাহাই হউক, রেবাকে বিবাহ সে করিতে পারিবে না। ইহাতে শশিকান্তবাবু যতই দুঃখিত হোন না কেন। বিবাহ কি ছেলেখেলা? একমাস আগে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল তপতীকে বিবাহ করিবেই, আর এখন আর একজন মেয়ের পিতার অশ্রু সহ্য করিতে না পারিয়া সে এই দ্বিতীয়াকে বিবাহ করিয়া বসিবে? তপতী শুনিলে বলিবে কি? তাহার বন্ধু অসীমের বিদ্রূপবাণে সে যে জর্জরিত হইয়া যাইবে!

রেবার কথা ভাবিয়া হয়ত একটু দুঃখ হয়। তাহার ত কোনই অপরাধ নাই। দুই বৃদ্ধের ষড়যন্ত্রের মাঝখানে পড়িয়া সে বেচারী হয়ত

হাবুডুবু খাইতেছে। তাহাকে ভাল কবিযা বুঝাইযা বলিলেই সব ঠিক হইযা যাইবে—সতেবো বছবেব মেযেব ভালবাসা, ইহা যৌবনেব উন্মেষে পুরুষের প্রতি নারীর অনাদি আকর্ষণ ছাড়া আব কিছুই নয। ইহাব মধ্যে না আছে গভীবতা না আছে সত্য।

কিন্তু টেলিগ্রামে বাবা লিখিযাছেন নাযেবমহাশয শীঘই আসিতেছেন। ইহাব অর্থ কি? নাযেবমহাশযকে সে না হয এডাইযা চলিবে কিন্তু নাযেব মহাশযেব পশ্চাতে পশ্চাতে বাবাও আসিতেছেন নাকি? কেন?

সুবিনয নিজেব কাছে স্বীকাব কবিতে বাধ্য হইল বাহিবে সে যতই আস্ফালন কবুক না কেন বাবাব সম্মুখে তাহাব সমস্ত দম্ভ এবং উষ্মা কোথায উডিযা যায। তাঁহাব গম্ভীব সান্নিধ্যে সে যেন নিতান্ত বালকেব মত অসহায এবং দুর্বল বোধ কবে এবং তাই যথাসম্ভব সে চেষ্টা কবে যাহাতে বাবাব মুখোমুখি হইতে না হয। হযত এই দুর্বলতা নিতান্ত অর্থহীন, কিন্তু ইহাব অস্তিত্বকে সে অস্বীকাব কবিতে পাবে না।

বন্ধু অসীম যদি এই সময কাছে থাকিত তবে হযত সে তাহাব সঙ্গে পবামর্শ কবিযা এই নূতন সমস্যাব একটা সমাধান বাহিব কবিযা নিত। কিন্তু সে যে অনেক দূবে! কোথায কলিকাতা কোথায মুসৌবী সহস্রাধিক মাইলেব ব্যবধান তাহাদেব মধ্যে!

অথচ শশিকান্তদেব সংসর্গ সে একেবাবে এডাইযাই বা চলে কি কবিযা? তাহাবা তাহাব সম্বন্ধে ভাবিবেনই বা কি! বেবা নিশ্চযই ইতিমধ্যে সব কথা শুনিতে পাইযাছে। সতেবো বছবেব মেযে তাহাব ভীবুতা দেখিযা ঈষৎ হাসি হাসিবে এ কিছুতেই সহ্য কবা যায না!

নাঃ ভয পাইলে চলিবে না। যেন কিছুই ঘটে নাই এমন ভাব দেখাইযা সে যথাবীতি শশিকান্তবাবুদেব গৃহে যাতাযাত কবিতে থাকিবে। দেখাই যাক না কোথাকাব জল কোথায যাইযা গডায।

পবেব দিন। শশিকান্তবাবুদেব কটেজেব দোবগোডাযই বেবাব সঙ্গে দেখা হইল। সুবিনযকে আসিতে দেখিযাই বেবা কোথায অন্তর্হিত হইযা গেল।

শশিকান্তবাবু বিছানায় শুইয়া ছিলেন। আগের দিনের ঘটনার পর তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত বোধ করিতেছিলেন- পেটের সেই ব্যথাটাও যেন নূতন করিয়া জাঁকিয়া উঠিয়াছিল।

ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি সুবিনয়কে অভ্যর্থনা করিলেন।

—আজ আপনার শরীরটা যেন একটু বেশি অসুস্থ দেখছি, কাকাবাবু?.. অকৃত্রিম উদ্বেগের সহিত সুবিনয় প্রশ্ন করিল।

—শরীরের কথা আর ব'লো না, বাবা! এ শরীর যতদিন পর্যন্ত চিতায় না উঠছে ততদিন তোমাদের সবাইকে ভাবিয়ে তোলাই বোধ হয় আমার বিধিলিপি'...সে যাক্, তুমি ভাল আছ ত?

—আমি? আমি বেশ ভালই আছি। ডাক্তারবাবু কি আজ এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, এসেছিলেন। পুরানো ওষুদ পালটে নতুন ওষুদ দিয়ে গেছেন। এরকম ব্যবস্থা বদ্‌লানো ত মুসৌরীতে এসে এই পাঁচবার হ'ল' যন্ত্র যেখানে একেবারে বিকল হয়ে গেছে সেখানে একমার্কা'র তেল বদ্‌লে আর একমার্কা'র তেল দিলেই কি আর চলে? আমার যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে, সুবিনয়!

তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, কাল তোমার সঙ্গে যেসব কথা হয়েছিল তারই জের টেনে দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই, সুবিনয়, তুমি রাগ করবে না ত?

—না, না, রাগ করব কেন?...সুবিনয় জবাব দিল।

—রেবার সঙ্গে তোমার বিয়ে অসম্ভব বলেছ।..এর কারণ হ'তে পারে দুটো, এক, রেবাকে তোমার পছন্দ হয় নি' আর, দুই, তুমি আর কাউকে ভালবাস। প্রথমটা যে সত্যি নয় তা' তুমি নিজেই প্রকারান্তরে আমাকে বলেছ। তাহ'লে কি আমি বুঝব যে তুমি আর কাউকে ভালবাস?

শশিকান্তবাবু যে সোজা এই প্রশ্নটি করিবেন সুবিনয় ভাবে নাই। তাঁহার এই তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, না, না, আমি আর কাউকেই ভালবাসি না, কাকাবাবু...

—তবে? তবে এই বিয়েকে তুমি এত অসম্ভব মনে করছ কেন সুবিনয়?

অত্যন্ত নির্মম কঠোর এই প্রশ্ন এবং ততোধিক নির্মম ও কঠোর হইবে ইহার উত্তর, যদি সত্য উত্তর দিতে হয়। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের কোটরগত চোখদুইটির দিকে তাকাইয়া নিষ্ঠুর সত্য কথাটা সুবিনয় কিছুতেই বলিতে পারিল না।

বলিল সত্যি কথা যদি বলতে হয় কাকাবাবু, তাহলে বলি রেবাকে কেন, কাউকে বিয়ে করতেই আমার এখন ইচ্ছে নেই। এক স্বাধীনভাবে বেশ আছি বন্ধনের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাই না।

ওঃ এই তোমার কারণ? প্রকাণ্ড একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শশিকান্তবাবু বলিলেন, আমি কেবলই ভাবছিলাম সুবিনয় আমার মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করল কেন! তা' চিরকুমার হয়ে ত তুমি থাকবে না সুবিনয় আজ না হয় দুদিন বাদে বিয়ে নিশ্চয়ই করবে তখন, তখন আমার রেবাকে ভুলো না যেন!

বলিয়া শশিকান্তবাবু দুই হাত দিয়া সুবিনয়ের হাত দুইটি আকড়াইয়া ধরিলেন।

সুবিনয় অস্ফুটকণ্ঠে বলিল আপনি শান্ত হোন কাকাবাবু বিয়ে যদি আমি করি রেবাকেই করব।

ধীরে ধীরে শশিকান্তবাবুর হাতের মুঠো শিথিল হইয়া আসিল। সুবিনয় লক্ষ্য করিল শশিকান্তবাবু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন

উচ্চৈঃস্বরে সে ডাকিল রেবা ও রেবা

বাড়ির ভিতর হইতে রেবা ছুটিয়া আসিল।

কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে গেছেন তুমি একটু দেখো আমি এখখুনি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি।

ডাক্তার আসিলেন। ততক্ষণে শশিকান্তবাবু সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু রোগীর বুকপিঠ পরীক্ষা করিয়া সুবিনয়কে অন্তরালে ডাকিয়া নিয়া তিনি বলিলেন অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। হঠাৎ কোনরকম শক্ পেয়েছেন।

আজ রাত কাটে কিনা সন্দেহ।...আপনারা দেখবেন রোগী যেন শান্ত থাকে।

পিতার এই আকস্মিক অবস্থা পরিবর্তন দেখিয়া রেবা তাহার অভিমান ভুলিয়া সুবিনয়কেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছিল। অশ্রুকলঙ্কিত মুখে প্রশ্ন করিল, কি হবে সুবিনয়দা'?

তুমি ভেবো না, রেবা। ডাক্তারবাবু বললেন হার্টের উপর হঠাৎ একটু চাপ পড়েছে, আজ রাতটা বিশ্রাম করতে পারলেই সুস্থ হ'য়ে উঠবেন। আমি এখন আর হোটেলে ফিরে যাব না, এখানেই রইলাম কাল সকালে কাকাবাবুকে সুস্থ দেখে তারপর যাব।

অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে রেবা সুবিনয়ের দিকে তাকাইল।

ডাক্তারবাবু যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল রাত্রি আর কাটিল না। মৃত্যুর ঘণ্টাদুই পূর্বে শশিকান্তবাবু সম্পূর্ণ সজ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং রেবাকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, মা রেবা, আমরা দু'জনেই সুবিনয়কে ভুল বুঝেছিলাম। বিয়েতে ওর যে আপত্তি সে হচ্ছে নিতান্ত নির্বাক্তিক আপত্তি কাউকেই সে এখন বিয়ে করতে চায় না, তার ইচ্ছা সে চিরকুমার থেকে তার স্বাধীনতা বজায় রাখবে। কিন্তু আমার কাছে সে স্বীকার করেছে, বিয়ে যদি কাউকে করতে হয় তাহ'লে তোকেই করবে। তাই নয় কি, সুবিনয়?

সুবিনয় ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়াছিল, হ্যাঁ

তাহার পর রেবার হাতখানি সুবিনয়ের হাতের উপর সঁপিয়া দিয়া শশিকান্তবাবু অশ্রুসজল চোখে বলিয়াছিলেন, মরবার আগে তোমাদের আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি তোমরা সুখী হবে। সুবিনয়, রেবার ভার তোমার উপরই রইল আর রেবা, মা, তুই কিন্তু সুবিনয়ের উপর অভিমান ক'রে থাকিস্ না।

ইহার পরই শশিকান্তবাবু সংজ্ঞা হারাইলেন এবং ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতেই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

হোটেলের বিল্ চুকাইয়া দিয়া সুবিনয় রেবাদের কটেজেই আসিয়া

উপস্থিত হইল। হোটেল হইতে বারবার ছুটাছুটি করা অত্যন্ত অসুবিধা-জনক—তাহা ছাড়া রেবা একাকী থাকেই বা কি করিয়া? রেবার দায়িত্ব যখন সে গ্রহণ করিয়াছে তখন তাহা সম্পূর্ণভাবে বহন করিবেই।

রেবা লুটাইয়া লুটাইয়া অনেকদিন কাঁদিল। তাহার সতেরো বৎসরের জীবনের একমাত্র সঙ্গীকে হারাইয়া সে নিজেকে অনুভব করিল অত্যন্ত অসহায়া। তাহার এই কান্নায় সুবিনয় বাধা দিল না—বরং ভাবিল রুদ্ধ অশ্রু যত বাহির হইয়া যায় ততই ভাল।

সুবিনয় দেখিল এবার সমস্যাকে এড়ানো চলিবে না। রেবা তপতী নহে স্বাধীনভাবে একা পৃথিবীতে চলার মত বিদ্যাবুদ্ধি বা ক্ষমতা তাহার নাই। ব্রততীর মত তাহাকে কোন বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা সংসারের নিষ্ঠুর বাত্যায় সে হইয়া যাইবে বিপর্যস্ত, ছিন্ন।

সুবিনয় আরও দেখিল ঘটনার আবর্তে তাহাকেই হইতে হইবে এই বৃক্ষ, যাহার আশ্রয়ে রেবা আবার নূতন ভঙ্গীতে জীবন আরম্ভ করিতে পারে। মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বে শশিকান্তবাবু যে কথাকয়টি বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা রেবার বুকে যেন পাথরখোদাই হইয়া বসিয়া গিয়াছিল, সমস্ত অভিমান, বিরক্তি ভুলিয়া গিয়া সে উন্মুখভাবে তাকাইয়া ছিল সুবিনয়ের দিকে।

ইতিমধ্যে নায়েব বিপ্রদাসবাবুও আসিয়া পৌঁছিলেন। সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, খোকাবাবু, আর তাহ'লে দেরি করছেন কেন? অশৌচটা কেটে গেলেই বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলি'

—না, না, নায়েবজ্যেঠা, এত তাড়াতাড়ি কেন? আরও কিছুদিন যাক্!... কিংকর্তব্যবিমূঢ় সুবিনয় বলিল।

—কিন্তু রেবা মা কোথায় থাকবেন, কে তাঁকে দেখবে?...লোকেই বা বলবে কি?

নিয়তি যেন তাহার মুক্তির সব কয়টি পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! উপায় নাই—রেবাকে বিবাহ করিতেই হইবে, অনতিবিলম্বে, তপতীর সঙ্গে আর একবারটি কথাবলার সুযোগও সে পাইবে না!

বিদ্রোহের শিখা মুহূর্তের জন্য সুবিনয়ের মনে জ্বলিয়া উঠিল,

কিন্তু অবশেষে জয়ী হইল তাহার ভীরু, সব-চেয়ে-সহজ-পথ-অনুসন্ধানী অবচেতন মন। ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, বেশ, আপনারা যা' ভাল মনে করেন তাই হোক্...

ব্রজমোহনবাবু সমস্ত কথা নায়েবমহাশয়ের চিঠিতে জানিতে পারিলেন। তীক্ষ্নবুদ্ধি বৃদ্ধ দেখিলেন যে প্রচলিত সমারোহের সহিত এই বিবাহ যদি সমাধা করিতে হয় তবে অনেক সময় লাগিবে এবং কে জানে ততদিনে সুবিনয়ের অর্ধসংযত মন আবার অসংযত হইয়া পড়িবে কি না! তাই তিনি আদেশ দিলেন অশৌচের পর মুসৌরীতেই যেন বিবাহকার্য সমাধা করিয়া সুবিনয় সস্ত্রীক দেশে চলিয়া আসে। বিবাহের খরচ উপলক্ষে বেশ মোটা অঙ্কের একটি চেক্ এবং তৎসঙ্গে আশীর্বাদী চিঠি তিনি পাঠাইয়া দিলেন সুবিনয়ের কাছে।

বিবাহে যে কোন সমারোহ করিতে হইল না ইহাতে সুবিনয় অনেকখানি তৃপ্তি বোধ করিল। কিন্তু তপতীর প্রতি এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতকতা তাহাকে করিতে হইল ইহার জন্য অসন্তোষ এবং বিরক্তি তাহার মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিল—সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে।

রেবার সহিত বিবাহের পর একটা মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। এই মাসটা সুবিনয়-রেবা ছিল দেশে ব্রজমোহনবাবুর কাছে।

ব্রজমোহনবাবুর সস্নেহ ব্যবহারে সুবিনয় বেশ অবাক হইয়া গিয়াছিল। পিতার এই মূর্তি সে বহুদিন দেখে নাই। গাম্ভীর্যের আবরণটা তিনি যেন জোর করিয়া টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং রেবার সঙ্গে প্রত্যেকটি কথায়, আচরণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আদর এবং স্নেহ। বাবাকে হারাইবার শোক রেবা অনেকখানি ভুলিয়া যাইতে পারিয়াছিল।

শুধু রেবার সঙ্গে নয়, সুবিনয়ের সঙ্গে ব্যবহারেও ব্রজমোহনবাবু যেন

একটু বেশি অমায়িক, একটু বেশি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে ব্রজমোহনবাবু দিনরাত জমিদারীর কাজ নিয়া ব্যস্ত থাকিতেন, তিনি সমস্ত বৈকালটা কাটাইতেন পুত্রের সংসর্গে। কলিকাতার কথা, কলেজের কথা, সুবিনয়ের বন্ধুবান্ধবদের কথা তিনি এমন ঔৎসুক্যের সহিত উত্থাপন করিতেন যে সুবিনয় দ্রবীভূত না হইয়া পারিল না। তাহার মনে হইল সে পিতাকে ভুল বুঝিয়াছে, তপতীর প্রতি বিবাহে তাঁহার অসম্মতির পিছনে ছিল শুধু অন্ধ সংস্কার, নিজের আহত মর্যাদা নয়। ফল হইল এই যে মাসখানেকের মধ্যে সুবিনয় পর্যন্ত ভাবিতে আরম্ভ করিল, পিতা বোধ হয় তপতীর সঙ্গে বিবাহে বাধা দিয়া বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন। যদি সে পিতার অমতে তপতীকে বিবাহ করিত তবে জীবন কি এমন নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে চলিয়া যাইতে পারিত?

তাহার আহত মনকে অনেকখানি সুস্থ করিয়া তুলিতে সাহায্য করিল রেবার ভালবাসা, সুবিনয়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি রেবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি, খুঁটিনাটি বিষয়ে রেবার নিপুণ পরিচর্যা। বিবাহের পর রেবার মনে কোনই ক্ষোভ বা সন্দেহ ছিল না—সুবিনয় তাহাকে যেটুকু আদর করিত, স্নেহ করিয়া যে সম্বোধন করিত তাহাতেই সে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া নিয়াছিল।

বুদ্ধিমান সুবিনয় তপতীর ইতিবৃত্ত ঘুণাক্ষরেও রেবাকে জানিতে দিল না। জীবনের যে অধ্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার জের টানিয়া লাভ কি? সে ত রেবাকে স্নেহ করে, হয়ত ভালও বাসে—ইহার মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গীতে তাহার বিবাহের পূর্বের প্রেমের কাহিনী বলায় কোন সার্থকতা আছে কি? মাঝখান হইতে রেবা শুধু ব্যথা পাইবে এবং তাহার ফলে তাহাদের শান্ত স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় অনাবশ্যক একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে!

কথাপ্রসঙ্গে ব্রজমোহনবাবুও এই উপদেশই সুবিনয়কে দিলেন। তপতীর নাম তিনি উল্লেখ করিলেন না বটে, কিন্তু যে দুই একটি কথা তিনি বলিলেন তাহার সারার্থ এই : মেয়েদের কাছে, বিশেষ করিয়া নিজের স্ত্রীর কাছে, বিবাহের পূর্বের জীবনের কথা খুলিয়া বলাটা মস্ত বড়

নির্বুদ্ধিতা, কারণ কোন মেয়েই স্বামীর পূর্বরাগের ইতিহাস সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না।

পরবর্তী জীবনে এই একটা মাসের স্মৃতি উলটাইয়া পালটাইয়া সুবিনয় দেখিতে পাইয়াছিল, বহুদিন একরকম শান্তিতে সে সময় কাটায় নাই।

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েকদিন পরই সুবিনয় গেল অসীমের কাছে।

—কি খবর? দু' তিনমাস অন্তর্ধান ক'রে কোথায় ছিলি? তপতী দেবীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিকা শেষ ক'রে এলি বুঝি?

—না, ভাই, ওসব কিছু নয়।...অনেক ঘটনা ঘটে গেছে এরই মধ্যে! বলিয়া সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া অসীম ত অবাক্! যে সুবিনয় মাস দুই তিন আগে তপতীকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, সে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত আর একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে! শুধু যে গতানুগতিকভাবে বিবাহ করিয়াই খালাস হইয়াছে এমন নয়, মোটের উপর বেশ খুসীই বলিয়া মনে হইতেছে! এই কি আজকালকার তরুণ-তরুণীদের ভালবাসা!..আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের উপর অসীমের ঘৃণা ধরিয়া গেল।..তাহার ভাগ্য ভাল এমন মানসিক আবর্তে সে কখনও পড়ে নাই।

সুবিনয় বোধ হয় অসীমের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিল। বেশ একটু লজ্জিতভাবে বলিল, কোনরকম জবাবদিহি করবার মুখ আমার নেই, অসীম। কি ক'রে যে সব ঘটে গেল ভাবলে আমি নিজেও অবাক্ হয়ে যাই!

শ্লেষের সহিত অসীম মন্তব্য প্রকাশ করিল, সত্যি?..আমি ত ভেবেছিলাম অবাক্ হ'য়ে যাওয়াটাও তোর স্বভাবের বহির্ভূত!

—ভাই অসীম, তুমি আমার চরিত্রের সব কয়টি দুর্বলতার খোঁজ রাখ, আমার অনুরোধ তুমিও আমাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিও না।...অত্যন্ত কাতরভাবে সুবিনয় বলিল।

খানিকটা নরম হইয়া অসীম বলিল, তোকে সাহসী ব'লে কখনও ভাবিনি' সুবিনয়, কিন্তু তবু আমার গোপন মনে আশা ছিল তোর মনুষ্যত্ব আর সবকিছু দুর্বলতাকে একদিন ছাপিয়ে উঠতে পারবে। এখন দেখছি ভুল আশা করেছিলাম।

তীব্র এই কশাঘাত খাইযা সুবিনয চুপ করিযা রহিল।

অসীম বলিল, আমাব কথা না হয ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তপতীদেবীব কাছে তুই কি জবাবদিহি করবি?

-আমি তাব সঙ্গে এখনও দেখা কবিনি'।

এটা অবশ্য আমার আগে থেকেই অনুমান করা উচিত ছিল। কিন্তু দেখা ত একদিন না একদিন কবতেই হবে। এই একই সহবে তোরা তিনজনে থাকবি -এবমধ্যে একজন আবেকজনেব কাছ থেকে কতদিন লুকিযে থাকতে পাববি? দেখা যখন হবে তখন কি বলবি? না দূব থেকে ভাণ কববি তুই তাকে আদৌ চিনিস না?

আমাকে তুমি এতখানি ছোটলোক ভাব, অসীম?

আমি কি ভাবি না ভাবি সে কথাব চেযেও বড এবং ভাল ক'বে বিবেচনার বিষয় হচ্ছে তুই কি ভাবছিস এবং তপতীদেবী কি ভাববেন। সমস্যাকে চিরকাল এডিযে যেতে তোরা পারবি না কাজেই আমার উপদেশ, সময থাকতে ভেবে রাখ কি ভাবে তুই তোব ভবিষ্যৎ-জীবন নিযন্ত্রিত কর্বাব।

—তুমি কি বল? হতাশভাবে সুবিনয প্রশ্ন করিল।

বিরক্ত হইয়া অসীম জবাব দিল তোব সেই এক কথা—তুমি কি বল? আমি কি বলব? একি আমার সমস্যা যে আমি তোব প্রশ্নেব জবাব দেব? অদ্ভুত এবং বিপবীত ব্যবহাব করছিস, আমি কি পরামর্শ দেব? আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে তোর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি যাই হোক্ না কেন, এখ্খুনি ঠিক ক'রে ফেল্—ঘটনাব আগে চলতে শেখ, ঘটনা যেন তোকে হতবুদ্ধি ক'বে না বসে।

—তপতীর সম্মুখীন হ'বার সাহস আমার নেই, অসীম।

-চমৎকার! কচি খোকা আর কি! নিজে করবেন সমস্ত অনর্থের

সৃষ্টি, তারপর বলবেন, আমি যা করেছি তার লজিক্যাল পরিসমাপ্তি আমি সহ্য করতে পারব না।...অসীম আবার রাগান্বিত হইয়া উঠিল।

অনুনয়ের সহিত সুবিনয় বলিল, এবার তোমায় আমাকে সাহায্য করতেই হবে।...তপতীর কাছে আমি পরে নিশ্চয়ই যাব, কিন্তু আমার বিয়ের খবরটা আমি নিজমুখে জানাতে পারব না। তুমি আমার হ'য়ে তার কাছে গিয়ে কথাপ্রসঙ্গে ঘটনাটা জানিয়ে দাও, অসীম।...না, এ কাজটি তোমাকে করতেই হবে।

অসীমের হাত দুইটি ধরিয়া সুবিনয় বলিল।

বন্ধুর এই কাপুরুষতা দেখিয়া অসীম একদিকে যেমন জ্বলিয়া উঠিল, অন্যদিকে তাহার অত্যন্ত করুণা হইতে লাগিল সুবিনয়ের অসহায়তা দেখিয়া।

—যদিও বা আমি তপতীদেবীর কাছে যাই, সুবিনয়, তবু একটা কথা তোকে ব'লে রাখছি। তাঁকে আমি যা-খুসী বলব, তোর স্বপক্ষে একটি বাক্যও আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হ'বে না।...এতে রাজী আছিস?

—তোমার উপর সব ছেড়ে দিয়েছি, অসীম। তুমি যেভাবে ভাল বোঝ আমার কথাগুলো তপতীকে ব'লো।

বেশ, তোর নিতান্ত অনুরোধে এই কাজের ভারটা আমি নিচ্ছি। কিন্তু, খবরদার, এই শেষ! এরপর কিন্তু তোর এই সব ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমাকে জড়াস্‌নি'!

সুবিনয়ের মুখে-চোখে গভীর কৃতজ্ঞতার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

কিন্তু একটা কথা ত তোকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি'! তোর স্ত্রী এসব পূর্বরাগের কাহিনী কিছু জানে?

—না।...ঢোঁক চিপিয়া সুবিনয় জবাব দিল।

—বলিস্‌নি' বুঝি?

—না।.. কি লাভ হবে ব'লে?

—আরও চমৎকার!... কি লাভ হবে ব'লে? সবসময় লাভ লোক-সানের হিসেবনিকেশ ক'রেই বুঝি তুই চলিস্?...নাঃ, তোকে দেখে আমার আজ মস্ত বড় শিক্ষা হ'ল।

এই কশাঘাতও সুবিনয় নীরবে সহ্য করিল।

—যাক্, কথা যখন তোকে দিয়েছি, তপতীদেবীর কাছে আমি আজ কালের মধ্যেই যাবো। কিন্তু আর না, তোদের এই সব কুটিল ব্যাপারের মধ্যে আমি আর থাকছি না!

অলক্ষ্যে নিয়তিদেবী অসীমের এই কথা শুনিয়া বোধ হয় একটু হাসিলেন।

যদিও অসীম অত্যন্ত তীব্রভাবে সুবিনয়ের ব্যবহারের সমালোচনা করিয়াছিল, তবু তাহার উদার মন প্রয়াস করিল সুবিনয়ের দিক দিয়া সমস্ত বিষয়টা পর্যবেক্ষণ করিতে। সুবিনয়ের দুর্বলতার পিছনে সে দেখিতে চেষ্টা করিল তাহার পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, তাহার হঠাৎ রেবাকে বিবাহ করার মধ্যে সে খুঁজিল নিয়তির অলঙ্ঘ্য হস্তক্ষেপ। সর্বোপরি, সে সমস্ত ব্যাপারটার উপর প্রতিফলিত করিল ব্যবহারিক জীবনের আইনকানুনের আলো, যে জীবনে শুধু আদর্শনিষ্ঠা মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে না।

তবু তপতীর বাড়িতে যাইবার পথে কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, আমি যদি সুবিনয় হ'তাম, কখ্খনো এইভাবে ব্যবহার করতাম না! কখ্খনো না—কখ্খনো না!

হস্টেলে যাইয়া শুনিল তপতীদেবী সেইদিনই মধুপুর হইতে ফিরিয়াছেন এবং স্নানাহার করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। ফিরিবেন রাত প্রায় আটটায়।

অসীম তাহার হাতঘড়িটার দিকে তাকাইল—সাড়ে-সাতটা।

স্থির করিল, আসিয়া যখন পড়িয়াছে তখন আর আধঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিয়াই যাইবে। এই দেখাটা যতশীঘ্র শেষ হয় সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

অভ্যাগতদের জন্য নির্দিষ্ট বসিবার ঘরে অসীম অপেক্ষা করিতে লাগিল।

আটটা বাজিয়া পনর মিনিট। অসীম অস্থিরভাবে একবার ঘড়ির দিকে, একবার দরজার দিকে তাকাইতেছে, আর ভাবিতেছে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবে কিনা। এমন সময় ধীরে দরজা খুলিয়া একটি মেয়ে প্রবেশ করিল।

প্রথম দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিয়াই অসীমের ভয়ানক ভাল লাগিল। শান্ত মুখশ্রী, মুখে বুদ্ধির রেখা জ্বলজ্বল করিতেছে, আড়ম্বরহীন অথচ স্নিগ্ধ বেশভূষা, প্রত্যেকটি গতিভঙ্গীতে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য। অথচ চোখের হাসিতে এমন একটি ছেলেমানুষি ভাব আছে যে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় তাহার বয়স আঠারো-ঊনিশের বেশি নয়!...অসীম বুঝিল এই মেয়েটিই তপতী, যদিও সুবিনয়ের কাছে তপতীর কথা শুনিয়া যে ছবি সে আঁকিয়া রাখিয়াছিল তাহার সঙ্গে এই আগন্তুকার কোনই মিল সে দেখিতে পাইল না।

উঠিয়া অগ্রসর হইয়া ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া সে প্রশ্ন করিল, আপনিই কি তপতীদেবী?

– হ্যাঁ, কেন বলুন ত?...বিস্মিতস্বরে তপতী প্রশ্ন করিল।

– আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। আমার নাম হচ্ছে অসীম রায়, আমি হচ্ছি একজন ডাক্তার।...কিন্তু আমার প্রফেসন্‌টা অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার, আমি এসেছি সুবিনয়ের কাছ থেকে, সুবিনয় আমার বহুদিনের বন্ধু।...

সুবিনয়ের কাছ হইতে আসিয়াছে? কেন? কোন দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনে নাই ত?..পলকের মধ্যে তপতীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল।

অসীম বলিয়া চলিল, আপনি ভাববেন না, সে বেশ ভালই আছে—খুবই সুস্থ।...তবে, তবে...

—হ্যাঁ, বলুন।...শান্তভাবে তপতী বলিল।

– দেখুন, এখানে ত নিরিবিলি কথা বলবার সুযোগ পাওয়া যাবে না, কখন কে এসে পড়ে স্থিরতা নেই।...আপনার যদি আপত্তি না থাকে, একটু বাইরে আসবেন?

—খুব দরকারী কথা কি?

—না, হ্যাঁ. একটু দরকারী বই কি!. আমাব গাড়ি রয়েছে, কাছাকাছি কোন একটা পার্কে যেতে পারলে বোধ হয় সুবিধা হ'ত!

অপরিচিত যুবকেব এই অদ্ভুত প্রস্তাবে তপতী প্রথমে যেন চমকাইয়া উঠিল। তাহাব পর বলিল. বেশ, চলুন।

বেশি দূরে অসীমকে যাইতে হইল না। ভবানীপুর ছাড়াইয়া লোয়ার সার্কুলাব রোডের মোড়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের পাশে মাঠের কাছে সে গাড়িটা থামাইল। বলিল, এইখানেই নামা যাক্. কি বলেন?

তপতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে তাহার কোন আপত্তি নাই।

টর্চের আলোতে পথ দেখিয়া তাহারা ঘাসের উপব আসিয়া বসিল মুখোমুখি হইয়া।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে তপতী প্রশ্ন করিল, এবার বলুন ডাঃ বায, আপনি কি বলতে চান আপনাব হঠাৎ এই আসাটা যেন কেমন হে'যালিব মত ঠেকছে!

আপনাব নার্ভ শক্ত আছে ত তপতীদেবী?

—খুব শক্ত আছে মিঃ বায। আব ভূমিকা কববেন না, ব'লে ফেলুন। 'কাতরভাবে তপতী বলিল।

—সুবিনয বিযে করেছে। এক নিঃশ্বাসে এই চবম কথাটা বলিযা ফেলিযা অসীম যেন অনেকখানি স্বস্তি পাইল।

- সুবিনয বি-য়ে করেছে? তপতীর মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহিব হইল না। সে আবার বলিল, সুবিনয় বি-য়ে করেছে?

অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত অসীম তপতীর হাতের নাড়িটির উপর নিজের আঙুল কয়টি রাখিয়া বলিল, আপনি শান্ত হোন, তপতীদেবী. সবকথা আপনাকে খুলে বলছি।

তপতী শান্ত হইতে পারিল না। ঝব্‌ঝব' কবিযা কাঁদিয়া ফেলিল।

' একটু পবে অশ্রুকলঙ্কিত মুখখানা মুছিবার প্রয়াস করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে তপতী বলিল. আপনি আমাদের কথা কতখানি জানেন আমার জানা নেই, ডাঃ রায়, কিন্তু সুবিনয়ের ব্যবহারের এরকম পরিসমাপ্তি যে আমার কাছে

অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকছে!...কেন সে বিয়ে করল? কাকে বিয়ে করল? কখন?...আমাকে খুলে বলুন, ডাঃ রায়!

মুহূর্তের মধ্যে অসীম তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া নিল। নূতন এক আঘাত হইতে তপতীকে বাঁচাইতেই হইবে। তাহাকে বলিতেই হইবে, এই বিবাহে সুবিনয়ের কোনই মত ছিল না—নিতান্ত অবস্থা বিপর্যয়ে পড়িয়া এক অনাথা মেয়েকে আশ্রয় দিবার জন্যই সে রেবাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। হয়ত এই কথাটি শুনিলে তপতী খানিকটা শান্তি পাইবে, সে যাহাকে এতখানি ভালবাসিয়াছে তাহার ভালবাসা যে একেবারে অন্তঃসার-শূন্য নহে এই খবরটুকু পাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন, নতুবা সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

অসীম বলিল, সুবিনয় নিজেই আপনার কাছে আসতে চেয়েছিল, তপতীদেবী, কিন্তু আমিই জোর ক'রে তাকে ঠেকিয়ে রেখেছি। আমিই বললাম, খবরটা সে নিজে না দিয়ে আর কেউ আপনাকে দিলে বোধ হয় ভাল হবে।...সুবিনয় এই বিয়েতে মোটেই সুখী হয়নি'!

প্রকাণ্ড এই মিথ্যা কথাটা অসীমের নিজের কাছেই উপহাসের মত শুনাইল।

অসীম বলিয়া চলিল, আপনার সঙ্গে শেষ কথাবার্তা হ'বার পর সে গিয়েছিল আমার কাছে। তখন তার শরীর ও মনের অবস্থা দেখে আমি তাকে পরামর্শ দেই কয়েকদিনের জন্য হাওয়া বদল করতে। সে চলে গেল মুসৌরীতে—একা। সেখানে অত্যন্ত দুঃস্থ এক বাঙালী পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র মেয়েকে রেখে সেখানেই মারা যান। মেয়েটির ত্রিভুবনে আর কেউ ছিল না, তাই সুবিনয় তার ভার গ্রহণ করতে বাধ্য হয়...এবং অবশেষে—অবশেষে আর কোন উপায়ান্তর না দেখে এই মেয়েটিকে সে বিয়ে করেছে।

বলিয়া অসীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

মৃদুকণ্ঠে তপতী প্রশ্ন করিল, আজ কতদিন হ'ল বিয়ে হয়েছে?

—তা' মাসখানেক হবে।

—ওঃ।...তপতী শুধু বলিল।

অসীম বলিল, বন্ধুর হ'য়ে ওকালতি করছি ভাববেন না, তপতীদেবী, তবে এটুকু বলতে পারি যে সুবিনয়ের রেবাকে বিয়ে না ক'রে আর কোন উপায় ছিল না! বয়স্থা সুন্দরী মেয়ে, তাকে কে আশ্রয় দেবে বলুন? আপনি ত সুবিনয়ের বাবার কথা জানেন--তিনি যদি শুনতে পেতেন যে সুবিনয় না বিয়ে ক'রে মেয়েটিকে ঘরে রেখেছে তাহ'লে রেগে আগুন হ'য়ে যেতেন!

মেয়েটির নাম বুঝি রেবা? বয়স কত?

—আমি তাকে দেখিনি, তপতীদেবী, শুনেছি তার বয়স সতেরো আঠারো হবে।

তপতী চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু বিয়ে করার পর অবধি সুবিনয় অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছে।

--উনি কিন্তু আমাকে বড় ভালবাসতেন, ডাঃ রায়।

—ভালবাসতেন নয়, তপতীদেবী, এখনও খুবই ভালবাসেন। স্বরের মধ্যে দৃঢ়তা ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া অসীম বলিল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। একেই বোধ হয় বলে বিধিলিপি!

—আমি এখন তাহ'লে উঠি, ডাঃ রায়। তপতী হঠাৎ বলিল।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। শশব্যস্তে অসীম উঠিয়া পড়িল।

হস্টেলের দোরগোড়ায় তপতীকে নামাইয়া দিবার সময় অসীম বলিল, সুবিনয় বোধ হয় দু'একদিনের মধ্যেই আপনার কাছে আসবে। তার কাছে আমার নিন্দে করবেন না যেন!

—নিন্দে? নিন্দে করবার মত কিছু ত বলেননি আপনি! ভালই হয়েছে সুবিনয়ের পরিবর্তে আপনি এসে এই খবরটা আমাকে দিয়ে গেলেন। সুবিনয় নিজে এলে বোধ হয় আমি সহ্য করতে পারতাম না। আচ্ছা, নমস্কার এবং অজস্র ধন্যবাদ।

তপতী ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

অসীম স্টার্টিং হ্যান্ড্ল্-এর উপর হাতটা রাখিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু একটা কথা বাহির হইল, ভাগ্যবান্ সুবিনয়!

*

*   *

সুবিনয় উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় অসীমের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অসীম যখন তাহার ফ্ল্যাট-এ ফিরিল তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

—দেখা হ'ল?...উৎসুকভাবে সুবিনয় প্রশ্ন করিল।

অসীম কোন জবাব দিল না। স্টেথস্‌কোপটা একটা ইজিচেয়ারের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সে লম্বা হইয়া আর একটা চেয়ারের উপর শুইয়া পড়িল।

একটু উদ্বিগ্নকণ্ঠে সুবিনয় প্রশ্ন করিল, তোমার অসুখ করেনি' ত?

তবু অসীম কোন কথা বলিল না।

সুবিনয় অগ্রসর হইয়া অসীমের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আবার প্রশ্ন করিল, অসীম, সুস্থ বোধ করছ ত?

এবার তিক্তকণ্ঠে অসীম জবাব দিল, আঃ, সব সময় আমাকে জ্বালাসনে, সুবিনয়। খানিকক্ষণ শান্তিতে থাকতে দে।

অপরাধীর মত সুবিনয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চক্ষু বন্ধ করিয়া অসীম কেবলই তপতীর কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, কেন এমন হয়? সুবিনয় কোন দেবতুল্য লোক নয়, অতি সাধারণ সে, সাধারণের মতই ভীরু, শঙ্কাকুল, অস্থিরচিত্ত। তাহার মধ্যে তপতী এমন কি দেখিতে পাইল যাহার ফলে সে তাহার সবকিছু অন্যায় অসংগত ব্যবহার ক্ষমা করিয়া নিতে পারিতেছে? মেয়েদের চরিত্রই কি এই? তাহারা কি সব সময়ই অন্ধ? কল্পনার আবরণ ভেদ করিয়া বাস্তবকে কি তাহারা কখনও দেখিতে পায় না?...সবচেয়ে সে বিস্মিত বোধ করিতেছিল এই ভাবিয়া যে তপতীর মত বুদ্ধিমতী মেয়ে কি করিয়া সুবিনয়ের প্রেমে পড়িল! যদি বা প্রেমে পড়িয়াছিল তবু তাহার চরিত্রের পরিচয় পাইয়াও সে প্রেমের কুহেলিকার বাহিরে চলিয়া আসিতে পারিল না?... তপতীর কাছ হইতে এই প্রকার অন্ধ সাধারণতা সে আশা করে নাই!

আর সেই বা কি বোকামি করিয়া আসিল! সুবিনয়ের সত্য পরিচয়টা না দিয়া সে কিনা তাহার কাপুরুষতাকে সমর্থন করিয়া আসিল! ঠিক কাপুরুষতাকে সমর্থন নয়, সে এমন কয়েকটি কথা বলিয়া আসিল যাহার ফলে সুবিনয়কে মনে হইবে অত্যন্ত হতভাগ্য, নিয়তির চক্রে নিষ্পেষিত আর একটি অসহায় জীবন! কি প্রয়োজন ছিল তাহার তপতীকে আঘাত হইতে বাঁচাইবার? আঘাত—যাহা সত্য, অতি নিদারুণ সত্য—তাহার পাওয়াই কি উচিত ছিল না বেশি?

প্রায় পনর মিনিট এইভাবে কাটিল। সুবিনয় ধীরে ধীরে বলিল, আজ তাহ'লে আসি, অসীম।

চক্ষু বন্ধ রাখিয়াই অসীম বলিল, না যাসনে। বোস্।

সুবিনয় বসিল।

—তপতীদেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে।...ধীরে ধীরে অসীম বলিল।

—সত্যি? কি কথা হ'ল?...শঙ্কায় দোদুল্যমান সুবিনয় প্রশ্ন করিল।

—তোর কথা সব খুলে বললাম।..সংক্ষেপে অসীম জবাব দিল।

—তপতী কি বলল?

—বললেন তোর আর মুখ দর্শন করবেন না!

সুবিনয়ের মুখখানা মলিন হইয়া উঠিল। রাত্রির স্বল্পালোকেও অসীম তাহা লক্ষ্য করিল।

—অবশ্য এজন্য তপতীদেবীকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তুই যা করেছিস তাতে তিনি যদি তোর মুখদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন তাহ'লেই আমি আশ্চর্যান্বিত হ'তাম বেশি!

সুবিনয় কোন কথা বলিল না। নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অসীম বলিল, তুই একটা আস্ত গাধা, সুবিনয়, ঠাট্টাও বুঝিস্ না!

বিস্মিতভাবে সুবিনয় অসীমের দিকে তাকাইল।

—আমি তোর হ'য়ে রীতিমত ওকালতি ক'রে এসেছি, সুবিনয়।

ব'লে এসেছি এই বিয়েতে তোর না ছিল হাত, না ছিল মত। আরও বলেছি যে বিয়ে ক'রে তুই ভয়ানক অসুখী হয়েছিস্।

—কেন এসব কথা তুমি বললে?

—কেন বল্লাম? আমি নিজেই জানিনে, সুবিনয়। তবে তোর প্রতি দয়াপরবশ হ'য়ে যে বলিনি' একথা সত্যি।...জানিস্ ত, আমি ডাক্তার; আমার পেশা হচ্ছে লোকদের নীরোগ করা, তাদের অসুস্থতা সারানো।... ডাক্তারের চোখ দিয়ে দেখলাম তপতীদেবীকে শক্ থেকে বাঁচাতে হবে। তাই নিজের মন-গড়া কতকগুলো কথা ব'লে গেলাম। দেখলাম, ঠিকই করেছি।

সুবিনয় কি বলিবে বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অসীম বলিল, কিন্তু আমার অনুরোধ, সুবিনয়, তোদের এই সব ব্যক্তিগত জটিলতার মধ্যে আমাকে জড়াস্‌নে। আমি সামান্য ডাক্তার, অনেক খেটেখুটে দু'টো পয়সা উপার্জন ক'রে খেতে হয়, আমি যদি তোদের এই নানারকম মনস্তত্ত্বের মধ্যে ডুবে যাই, তাহ'লে ব্যবসা আমার মাথায় উঠবে। ফলে না খেয়ে মারা যাব।...আর জানিস্‌ই ত, আমার ত তোদের মত বাবার জমিদারী নেই যে নিজের খুসীমত যা' ইচ্ছে ক'রে যাব, ফলাফলের জন্য নিজে দায়ী হ'ব না, দায়ী করব ঘটনাচক্রকে, নিয়তিকে!

অসীমের শেষের কথাকয়টির মধ্যে শ্লেষের সুর বাজিয়া উঠিল।

—তুমি আমার উপর রাগ করেছ, অসীম।

—রাগ করব না? ছিলাম বেশ শান্তিতে, তুই নিয়ে এলি অশান্তি! ব্যাচেলার মানুষ, আমার কি তোদের ভালবাসার এই নানারকম ঝামেলা পোষায়?...নাঃ, কিছুতেই না, আর কখখনো তুই আমার কাছে এসব সমস্যা নিয়ে আস্‌বি না, বুঝলি?

সুবিনয় বলিল যে সে অসীমকে তপতীর বিষয় নিয়া আর বিরক্ত করিবে না, এবং অসীম যে তাহাকে সমর্থন করিয়া এতখানি ওকালতি করিয়া আসিয়াছে সেজন্য সে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

বলিয়া সুবিনয় বাহির হইয়া আসিল। আসিতে আসিতে সে শুনিল অসীম চীৎকার করিয়া বলিতেছে, কিন্তু তপতীদেবীর সঙ্গে তুই যেদিন

দেখা করতে যাবি সেদিন তিনি আমার সম্বন্ধে কি বলেন তা' আমাকে বলতে ভুলিস না যেন!

অসীমের ফ্ল্যাট হইতে সুবিনয় সোজা বাড়ি ফিরিল।

দোরগোড়ায় তাহার প্রতীক্ষায় রেবা দাঁড়াইয়া ছিল। প্রশ্ন করিল, এত দেরি হ'ল যে? তোমার বন্ধু ত চমৎকার লোক, এত রাত পর্যন্ত তোমাকে আটকে রেখে দিলেন?

তাহার চোখে কৌতুক, মুখে অর্থপূর্ণ হাসি।

অসীমের সঙ্গে কথাবার্তার পর সুবিনয়ের মনটা খুবই খুশীতে ভরিয়া ছিল। সে-ও সমান ওজনে জবাব দিল, তোমার অজুহাত দিয়েই না তবু ছাড়া পেলাম! ছাড়তে কি আর চায়, ব্যাচেলার লোক ত নববিবাহিতের দুঃখ বুঝতে পারে না, অবশেষে যখন মুখ ফুটে বললাম যে আমার জন্য একটি সুন্দরী তরুণী পথচেয়ে বসে আছেন এবং ভাবছেন কখন এসে তাঁর দয়িত তাঁকে আলিঙ্গন করবেন, তখন বন্ধুর হুঁস হ'ল

—যাও, তুমি ভারি অসভ্য! যেন কুপিত হইয়াছে এই ভাব দেখাইয়া রেবা বলিল।

—অসভ্য হ'তে পারি কিন্তু তুমিই ব'লো, আমার কথাটা সত্যি কি না!

—অস্বীকার আর করি কোন্ সাহসে, যখন তুমি দয়া ক'রে আমাকে গ্রহণ করেছ!.. রেবার এই কথাকয়টির মধ্যে একটা কাতরতা ফুটিয়া উঠিল।

স্ত্রীকে আদর করিয়া সুবিনয় বলিল, ছিঃ রেবা, দয়ার কথা ব'লো না! আমি কি তোমাকে বিয়ে করেছি নিছক দয়াপরবশ হ'য়ে? না, গো, না, আমি তোমাকে বিয়ে করেছি নিতান্ত তোমাকে বিয়ে না ক'রে উপায় ছিল না ব'লে!

—মানে?. .সন্দিগ্ধস্বরে রেবা প্রশ্ন করিল।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া সুবিনয় জবাব দিল, মানে শুধু এই · প্রথমে ভেবেছিলাম বিয়ে না ক'রে জীবন ত বেশ চলে যাচ্ছে, তবে কেন বন্ধনের মধ্যে নিজেকে টেনে আনি? তারপর তোমাকে দেখে মনে হ'ল, না, তোমাকে হাতছাড়া করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, কারণ বৌ-ছাড়া জীবন ততক্ষণই

ভাল যতক্ষণ বৌ-এর চিন্তা মনে না হয়।...এ যেন এক নেশা, নেশার আমেজ যদি একবার চোখে এসে লাগল তাহ'লে যতক্ষণ তা' পুরোপুরিভাবে না পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বস্তি নেই, তৃপ্তি নেই। বুঝলে গো?...বলিয়া সুবিনয় রেবার ঠোঁটে আরও একটি চুম্বন মুদ্রিত করিল।

আরও গভীর রাত্রি। সুবিনয় রেবা দুইজনেই বিছানায় শুইতে আসিয়াছে। অন্ধকার ঘরে মশারির ফাঁক দিয়া চাঁদের কয়েকটুকরা আলো আসিয়া পড়িয়াছে। সুবিনয়ের বুকে মাথা রাখিয়া রেবা করিল সেই অনাদিকালের প্রশ্ন: তুমি আমাকে সত্যি ভালবাস গো?

আর সুবিনয় রেবার সুন্দর লালিত্যপূর্ণ মুখখানা নিজের দুইটি হাতের মধ্যে তুলিয়া নিয়া আদর করিতে করিতে অনাদিকালের জবাব দিল, আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি, বৌ...খু-ব ভালবাসি...ভয়া-নক ভালবাসি...

আমি, সুবিনয়-রেবা-তপতীর জীবনের চিত্রকর, জানি কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

ভালবাসার রূপ সম্পর্কে অনেক পণ্ডিতের মতামতই বিবাহের পূর্বে সুবিনয় পড়িয়াছিল, কিন্তু নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোন্ কথাটি শাশ্বত এবং সত্য তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই তপতীকে দেখিয়া যখন সে মনে করিয়াছিল যে সে তপতীর প্রেমে পড়িয়াছে তখন মনে হইয়াছিল ইহাই সবচেয়ে বড় সত্য—ইহার চেয়ে বড় সত্য বুঝি আর কিছু নাই। আবার যখন সে রেবাকে বিবাহ করিয়া বেশ নির্বিঘ্নে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিল এবং রেবা শুধু বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে নয়, প্রিয়া হিসাবেও তাহার দাবী জানাইল, তখন সেই দাবীও সে মিটাইতে চেষ্টা করিল—কেবল কর্তব্য-বোধে নয়, বেশ খানিকটা আনন্দের সহিত। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে হইল, রেবার প্রতি এই আকর্ষণটাই বুঝি চরম সত্য।

যৌনসম্বন্ধের মধ্যে যে একটা মাদকতা আছে তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইল সুবিনয়-রেবার এই বিবাহিত জীবনে। রেবার ভালবাসায়, তাহার স্পর্শময় সান্নিধ্যে সুবিনয় তপতীর অভাব অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল, এবং অনেক সময়ই তাহার মনে হইতে লাগিল, তপতীকে সে যথার্থ ভালবাসে নাই, সে ভালবাসিয়াছিল একটি নারীমূর্তিকে। তপতীকে দিয়া জীবনের যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সে চরিতার্থ করিতে পারে নাই, তাহা সে চরিতার্থ করিল রেবাকে গ্রহণ করিয়া, এবং বিবাহের প্রথম ছয়টা মাস সে বেশ সুখেই কাটাইল।

রেবার কোন ক্ষোভই ছিল না। পিতার মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বে সুবিনয়ের অস্বীকারে তাহার মনে যে অভিমানের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছিল বিবাহের পরে স্বামীর স্নেহপূর্ণ সযত্ন ব্যবহারে। বিবাহের পূর্বে সুবিনয় আর কাহাকেও ভালবাসিত কিনা এই জাতীয় কোন প্রশ্নই তাহার মনে ওঠে নাই এবং উঠিবার কোন সুযোগ বা কারণও সুবিনয় দেয় নাই। তপতীর কথা, তপতীর সঙ্গে তাহার কি সম্বন্ধ ছিল, তপতীকে যে একদিন সে বিবাহ করিতে পাগল হইয়া উঠিয়াছিল, এসমস্ত বিষয় ত সে ঘূণাক্ষরে রেবাকে বলেই নাই, পরন্তু সে অতি সতর্কভাবে গোপন করিয়া গিয়াছিল তপতী সম্বন্ধে অসীমের সঙ্গে তাহার কথোপকথন এবং তপতীর সঙ্গে অসীমের সাক্ষাতের ইতিবৃত্ত।

সুবিনয়ের এই সতর্কতা এতদূর গড়াইয়াছিল যে বিবাহের পর অবধি সে অসীমকে কখনও তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করে নাই। সস্ত্রীক দেশ হইতে ফিরিবার পর সুবিনয় অসীমকে একবার ডাকিয়াছিল—নিছক ভদ্রতাসূচক এই ডাকা। সেদিন অসীমের একটা জরুরী কল্ পড়িয়া যাওয়ায় সে আসিতে পারে নাই। সেজন্য মুখে সুবিনয় দুঃখপ্রকাশও করিয়াছিল বটে কিন্তু অসীমকে আসার দ্বিতীয় সুযোগ সে দেয় নাই।.. তাহার ভয় ছিল কথাপ্রসঙ্গে তপতীর কথা হয়ত বা অসীম বলিয়া ফেলিবে!

রেবা দুই-একবার অসীমের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। বলিয়াছিল, তোমার এমন বন্ধু অসীম রায়, সেই যে একদিন আসবেন ব'লে আসতে

পারলেন না, তারপর একেবারে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন দেখছি!...একদিন ব'লোনা তাঁকে আসতে।

সুবিনয় জবাব দিয়াছিল, অসীম হচ্ছে অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ, রেবা।... ডাক্তার মানুষ, সব সময় একটা না একটা জরুরী কল্ তার লেগেই আছে! আমিই তার দেখা পাই না, সে কি আর ফুরসৎ পাবে আমাদের এখানে আসতে!

তবু রেবার অনুনয়ে সে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল অসীমকে একবার টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু রেবা যখনই তাহাকে তাহার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করাইয়া দিয়াছিল, তখনই সে জবাব দিয়াছিল, অসীম কিছুতেই সময় ক'রে উঠতে পারছে না, রেবা।

কিছুদিন পরে রেবাও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অসীমের কথা নিয়া স্বামীকে সে আর বিরক্ত করে নাই।

ইতিমধ্যে ব্রজমোহনবাবুও একবার কলিকাতায় আসিয়া সুবিনয়-রেবার দাম্পত্যজীবনযাত্রা দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহার চিরদিনের সহচর নায়েব বিপ্রদাসবাবু।

আটচল্লিশ ঘণ্টাখানেক সুবিনয়দের সঙ্গে থাকিয়াই ব্রজমোহনবাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। গভীর একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বিপ্রদাসবাবুকে বলিলেন, নায়েবমশায়, আপনার মুসৌরী যাত্রাটা সর্বদিক দিয়েই জয়যুক্ত হয়েছে!

বিপ্রদাসবাবু সায় দিয়া জবাব দিলেন, সে কথা আর বলতে!...এখন একটি খোকা হ'লেই আমাদের খোকাবাবু একেবারে শায়েস্তা হ'য়ে যাবেন!

নিমীলিতচোখে ভাবী পৌত্রের মুখখানা কল্পনা করিতে করিতে ব্রজমোহনবাবু বলিলেন, জীবনে অধর্ম ত কখনও করিনি', ভগবান নিশ্চয়ই আমার এই অভিলাষটুকু অমঞ্জুর রাখবেন না!

সপ্তাহ দুই পরে ব্রজমোহনবাবু নায়েবমহাশয় সমভিব্যাহারে দেশে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার পূর্বে সুবিনয়কে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি সুখী হবে এটাই ছিল সর্বদা আমার কামনা। ভগবান

আমার প্রার্থনা শুনেছেন, পিতার আদেশ শুনে তুমিও ঠকোনি'! আশা করি এর পর থেকে তোমার মধ্যে দেখব বয়সোচিত গাম্ভীর্য, তোমার পরিবারের মর্যাদার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা। তোমার কর্তব্য কি এবং কোন্ পথে, তা' আমাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হ'বে না!

পিতার পদধূলি নিয়া সুবিনীত সুবিনয় বলিয়াছিল, আপনি আমাকে শুধু আশীর্বাদ করবেন।

ব্রজমোহনবাবু চলিয়া গেলেন, সুবিনয়-রেবার জীবনযাত্রা আবার চলিতে লাগিল গতানুগতিক ছন্দে, নির্বিঘ্ন স্বাচ্ছন্দ্যে। তপতীর স্মৃতি সুবিনয়ের কাছে অপেক্ষাকৃত ঝাপসা কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, অসীমের কাছে তাহার যাতায়াতও অত্যন্ত বিরল হইয়া উঠিল।

তাহার পর হঠাৎ একদিন—তাহাদের বিবাহের প্রায় সাত মাস পরে—অঘটন ঘটিল।

সুবিনয় সেদিন চলিয়া গিয়াছে কলেজে, আর অলস মধ্যাহ্নে রেবা গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে এবং সুবিনয়ের পুরানো পুঁথিপত্র নিয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। তাহার ভয়ানক ইচ্ছা করিতেছে সুবিনয় কলেজ হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলে তাহারা নিকটবর্তী সীনেমায় যাইবে একটা ছবি দেখিতে। এমন সময় একটা বই-এর পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে বাহির হইয়া আসিল একখানা চিঠি।...মেয়েলি হাতে লেখা, খামের উপরে সুবিনয়ের নাম।

কৌতূহলী হইয়া রেবা চিঠিটি খুলিল।

চিঠিটি এমন কিছুই নয়। প্রায় এক বৎসর পূর্বে লেখা, তপতী নামে একটি মেয়ে চিঠিটির লেখিকা। শ্রদ্ধাস্পদেষুকে তপতী জানাইয়াছে যে সে আগামী শনিবার দিন নির্দিষ্ট সময়ে হস্টেলে থাকিবে না, অতএব শ্রদ্ধাস্পদ যেন সেদিন না আসিয়া তাহার পরের মঙ্গলবার দিন আসেন। চিঠির শেষভাগে একটু উদ্বিগ্ন প্রশ্ন আছে, সেদিন শরীরটা ভাল ছিল না, জ্বরটর হয়নি' ত?

সম্ভ্রমপূর্ণ সম্বোধন—সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষা। কিন্তু রেবার খারাপ লাগিল

দুইটি বিষয়, প্রথম, চিঠিতে লেখিকার ঠিকানা নাই কেন, এবং দ্বিতীয়, সুবিনয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এতখানি উৎকণ্ঠা প্রকাশেরই বা কি প্রয়োজন?

সর্বোপরি তাহার কাছে রহস্যপূর্ণ মনে হইল এই কথাটি যে তপতী-নাম্নী কোন মহিলার কথা ত সুবিনয় তাহাকে এপর্যন্ত বলে নাই! কে এই তপতী? তাহার বয়স কত? সুবিনয়ের সঙ্গে কি তাহার সম্বন্ধ?

সুবিনয় তাহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে এমন কোন ধারণা রেবার মনে হইল না, তাহার প্রশ্নের মধ্যে দেখা দিল শুধু কৌতূহল এবং বিস্ময়। সে উৎকণ্ঠিতভাবে সুবিনয়ের প্রত্যাবর্তন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে রহস্যপূর্ণ চিঠিখানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল।

কলেজ হইতে ফিরিয়া সুবিনয় দেখিল রেবার দুইটি চোখ প্রশ্নে ভরা। জিজ্ঞাসা করিল, কি গো, কোন খবর আছে না কি?

- আছে গো, আছে। বেশ একটু মজার খবর!. লঘুচ্ছন্দে রেবা জবাব দিল।

– কি, ব'লেই ফেল না!

—খবরটা হচ্ছে এই যে তপতীদেবী তোমার কাছে চিঠি লিখেছেন।... বেশ হাসিতে হাসিতেই রেবা বলিল।

—আঁা, চিঠি লিখেছে?...স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া সুবিনয় প্রশ্ন করিল।

এই দেখ না তাঁর চিঠি!.. বলিয়া সেই পুরাতন চিঠিটি রেবা সুবিনয়ের হাতে দিল।

চিঠিখানা খুলিয়া সুবিনয় তাড়াতাড়ি পড়িল—পড়িয়া সে বিশ্বাস করিতে পারিল না।...তপতী তাহার কাছে লিখিয়াছে সে যেন শনিবার দিন নির্দিষ্ট সময়ে না যাইয়া পরের মঙ্গলবার দিন যায়। . কিন্তু শনিবার দিন যে সে দেখা করিতে যাইবে এমন কথা তপতীকে কে বলিল? ..তাহার পর তাহার অসুস্থতার কথা—হ্যাঁ, কয়েক দিন ধরিয়া তাহার শরীরটা ভাল যাইতেছে না সত্য, কিন্তু এ সংবাদও তপতীকে কে দিল?

বিহ্বলের মত অনেকক্ষণ সুবিনয় চিঠিটার দিকে তাকাইয়া রহিল।

রেবা স্বামীকে লক্ষ্য করিতেছিল এবং মনে মনে বেশ কৌতুক

উপভোগ করিতেছিল। স্বামীর হতবুদ্ধিতা দেখিয়া তাহার সন্দেহের চেয়ে আমোদই হইতেছিল বেশি।

বলিল, কি গো, চিঠি পড়ে চুপ ক'রে রইলে যে!

হঠাৎ সুবিনয়ের নজর পড়িল চিঠিটার দক্ষিণ কোণে, যেখানে তারিখটা লেখা ছিল। কি বোকাই না বনিয়াছে সে.. এ যে এক বৎসর আগেকার লেখা চিঠি!

কিন্তু রেবা এ চিঠি কোথায় পাইল? নিশ্চয়ই তাহার পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে পাইয়াছে!...উঃ, কি ফাঁড়াটাই না সে কাটাইয়া উঠিয়াছে! চিঠিটা পুরাতন এবং অত্যন্ত নির্দোষ। ইহার একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করা তেমন কঠিন হইবে না।...রেবা নিশ্চয়ই তাহাকে সন্দেহ করিতে আরম্ভ করে নাই—না, তাহার চপল, হাসি, চটুল লাস্য দেখিয়া ত তাহা মনে হয় না।

মুহূর্তের মধ্যে সে নিজের কর্মপদ্ধতি স্থির করিয়া নিল।

—তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছিলে, রেবা! আমি অবাক্ হ'য়ে ভাবছিলাম কে আবার আমাকে চিঠি লিখবে এই ব'লে যে শনিবার দিন আমি তার সঙ্গে এন্‌গেজমেণ্ট্ করেছিলাম দেখা করবার! এ যে এক বছরের পুরানো চিঠি!

—জানি, গো, জানি।..আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই তপতীদেবীটি কে? এ'র কথা ত কখনও আমাকে ব'লোনি' !

—ওঃ, এই! .অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরা স্বরে সুবিনয় বলিল।...আরে, এ যে আমার বন্ধু অসীমের চেম্বারের নার্স গো! আমার শরীরটা খারাপ বোধ করছিলাম, আমি অসীমের কাছে গিয়েছিলাম। অসীমকে ত জান না তুমি, গায়ে দুই একটা টোকা দিয়েই সে আমাকে ফেলে দিল তার নার্সের জিম্মায়, বল্‌ল, আমি তপতীকে ব'লে দিয়েছি, ওই তোমাকে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে!..তারপর বোধ হয় শনিবার দিন আমার আবার যাবার কথা ছিল, এবং সেটা উল্লেখ ক'রেই নার্স আমাকে এই চিঠি লিখেছিল।

এক নিঃশ্বাসে এই মনগড়া কাহিনীটি সুবিনয় বলিয়া গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া বুঝিল রেবা তাহার বিবৃতিটি প্রায় বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে।

—কিন্তু হস্টেল কেন? তোমাকে কি তার হস্টেলে যেতে হ'ত নাকি?

—ওটা হচ্ছে অসীমের খামখেয়ালি। শনিবার দিন সে তার চেম্বার বন্ধ রাখত কিনা, তাই নার্সকে সেদিন পেতে হ'লে আমাকে (বা অন্য যে কোন রোগীকে) তার হস্টেলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

—তপতী ত জানতই তোমার শরীর অসুস্থ, তবু আবার এ প্রশ্ন কেন, আপনার জ্বরটর হয়নি' ত?

—কেন লিখেছে তার জবাব আমি কেমন ক'রে দেব, রেবা?...বেশ যেন একটু আহতস্বরেই সুবিনয় বলিল।...আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, আমি অসীমকেই ডেকে পাঠাচ্ছি, তার মুখেই তুমি সব শুনো!

বিপুল সাহসের সহিত সুবিনয় এই কথাগুলি বলিল। রেবার মুখচোখের ভাব দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছিল সে তাহার কাহিনী প্রায় গ্রহণ করিয়া নিয়াছে, এখন একটা চরম প্রমাণ পাইলেই তাহার কৌতূহল নির্বাপিত হয়।...অসীমকে ডাকিয়া আনার প্রস্তাবই হইল এই চরম প্রমাণ—ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন হইল না, প্রস্তাবই হইল যথেষ্ট।

লজ্জিতভাবে রেবা বলিল, কি যে যা' তা' বলছ তুমি! তোমার কথা অবিশ্বাস ক'রে আমি ডাঃ রায়ের কাছে প্রমাণ চাইব, এমন ছোট মন আমার নয়।...চিঠিটা আমার একটু অদ্ভুত লাগছিল, তাই না তোমাকে এতগুলো প্রশ্ন করলাম! যাক্, এ সামান্য বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করব না।

বলিয়া রেবা সত্যসত্যই চিঠিখানা ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দিল।

রেবার দিক দিয়া ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হইল বটে, কিন্তু ঘটনাটা সুবিনয়ের মনে চাঞ্চল্য আনিল দুইভাবে। প্রথমতঃ, সে দেখিল সংসারের আবর্ত অত্যন্ত জটিল, কখন কোন্ ফাঁকে তপতীর সঙ্গে তাহার পূর্বরাগের কাহিনী রেবার কাণে পেঁাছায় তাহার কোনই স্থিরতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, রেবার সাহচর্যে এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মত্ততাজনক প্রলেপে যে স্মৃতি

প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল তাহা যেন নূতন এক রূপ পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহার মন চলিয়া গেল সেই একটি বৎসর আগেকার চঞ্চলময় দিনগুলির পাতা খুঁজিতে। তখনও সে এখনকার মত স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসী এবং যেন-তেন-প্রকারেণ শান্তিলোলুপ হইয়া ওঠে নাই। নূতন একটা অনুভূতি, অননুভূতপূর্ব একটা চাঞ্চল্য তাহার বৈচিত্র্যহীন অত্যন্ত সাধারণ জীবনে অদ্ভুত একটা সাড়া আনিয়াছিল, যাহার প্রভাবে তাহার মত পিতৃভক্ত, সমাজভক্ত, সুশীল যুবকও একবার সত্যসত্যই ভাবিয়াছিল যে সে বিদ্রোহ করিয়া বসিবে।. .কোথায় চলিয়া গেল সেই অনুভূতি, কালের অচঞ্চল গর্ভে কি অদ্ভুতভাবে মিলাইয়া গেল সেই দিন কয়টি!

আর কি সেই মুহূর্তগুলি একেবারেই ফিরিয়া আসিবে না? .. ভাবিতেই সুবিনয়ের বুকটা হঠাৎ যেন বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে অনুভব করিল, বহুদিনের পুরাতন একটা ক্ষত যেন আচমকা একটা আঘাত খাইয়া নূতন যন্ত্রণায় আতুর হইয়া জাগিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে জাগিল প্রশ্ন। রেবাকে বিবাহ করিয়া সত্যই কি সে সুখী হইয়াছে? পিতার আশীর্বাদ, সমাজের অনুমোদন, রেবার শ্রদ্ধাভালবাসা ইহার কোনটাই কি তাহার জীবনের সমস্ত অভাব মোচন করিতে পারিয়াছে?...আর সে নিজে যে রেবাকে ভালবাসে, অন্ততঃ মনে করে যে ভালবাসে, তাহার মধ্যে মনের ভালবাসা আছে কতটুকু? তাহার এই ভালবাসা কি একটা দৈহিক পরিতৃপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতারই ওপিঠ নয়?

সাতমাস ধরিয়া সে নিজের সঙ্গে এ কি খেলা খেলিয়া আসিয়াছে? শুধু খেলা নয়—এ যে রীতিমত বঞ্চনা! অথচ এই বঞ্চনাকে বজায় রাখিবার জন্য সে কত অসংখ্য প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে! .. নিজে যে কতখানি নিম্নস্তরে নামিয়াছে তাহা সুবিনয় আজ প্রথম উপলব্ধি করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনায় তাহার মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল।

না—এইভাবে বেশি দিন সে আর চলিতে পারিবে না। যে বেড়াজালের মধ্যে সে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি নিতেই হইবে—নতুবা সে গভীর অতলে তলাইয়া যাইবে।

অত্যন্ত অশান্তমনে অনেকদিন পর সুবিনয় আবার ছুটিয়া গেল বন্ধু অসীমের কাছে।

অসীমের সেদিন বিশেষ কোন কাজ ছিল না, সে ঈজিচেয়ারে বসিয়া আরাম করিতেছিল।

সুবিনয়কে দেখিয়া সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

—আরে, সুবিনয় যে! তারপর, খবর কি? এতদিন ছিলি কোথায়? তোদের মধুচন্দ্রিকা বুঝি এখনও শেষ হ'লো না?...একনিঃশ্বাসে অনেকগুলি প্রশ্ন অসীম করিয়া ফেলিল।

সুবিনয় একটা চেয়ার টানিয়া নিয়া বসিল।

বলিল, একটু জিরুতে দাও, অসীম। তোমার সব কথারই জবাব দিচ্ছি ধীরে ধীরে।... ছিলাম এই কলকাতাতেই, খবর কিছুই নেই, দিন চলছে যেভাবে আর দশ-পাঁচজনের চলে, অর্থাৎ সুখে, শান্তিতে, স্বাচ্ছন্দ্যে।

—হ'লো না, সুবিনয়, আর দশ-পাঁচজনের জীবন নিশ্চয়ই সুখে, শান্তিতে, স্বাচ্ছন্দ্যে চলে না!...অসীম মন্তব্য করিল।

—আমি বলছি নববিবাহিত দশ-পাঁচজনের কথা, পুত্র-পৌত্র সম্পদে সমৃদ্ধ গৃহস্থদের কথা বলছি না।...অসহিষ্ণুভাবে সুবিনয় জবাব দিল।

—আজ দেখছি তোর মেজাজটা তেমন সুবিধের নেই, সুবিনয়!... সে যাক্—তারপর হঠাৎ এই আগমনের হেতু?

—তপতীর সঙ্গে এর মধ্যে তোমার দেখা হয়েছে? তার কোন খবর জান?

—জানলেও তোকে বলব কেন?...সকৌতুকে অসীম জবাব দিল।

—আঃ, ঠাট্টা ক'রো না, অসীম। আমি কিন্তু তার সঙ্গে আদৌ দেখা করিনি', তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম...

কথাটা সুবিনয় শেষ করিতে পারিল না।

—তোকে ত অনেক আগেই বলেছিলাম, সুবিনয়, তোদের গোলমালের মধ্যে আমি নেই। তবে আবার আমাকে জেরা করছিস্ কেন?

—সত্যি তপতীর কোন খবর তুমি জান না?...অত্যন্ত অসহায়ভাবে সুবিনয় আবার প্রশ্ন করিল।

তাহার অসহায় অবস্থা দেখিয়া অসীমের বোধ হয় দয়া হইল। সে বলিল, জানি, বন্ধু, জানি...

—ব'লো, শীগ্‌গীর ব'লো।...প্রায় চীৎকার করিয়া সুবিনয় বলিয়া উঠিল।

—একটু আগেই আমি তপতীদেবীর ওখান থেকে এলাম। তাঁর বড্ড অসুখ, সুবিনয়!...

—অ্যাঁ, অসুখ? কি অসুখ?...আশঙ্কায় সুবিনয় বিবর্ণ হইয়া গেল।

—অসুখটা যে কি তা' যে আমি হেন ডাক্তারও ধরতে পারছি না! আসলে অসুখটা হচ্ছে মনের, যদিও শরীরে দেখছি হার্টটা দুর্বল, অল্প অল্প জ্বর, মাথায় নাকি মাঝে মাঝেই অসহ্য যন্ত্রণা...

—কতদিন ধরে এরকম চলেছে?

—তা' মাস দুই হবে।...যদিও কিছুদিন আগে পর্যন্ত সব লক্ষণগুলো এতখানি প্রকট হয়ে ওঠেনি'।...আজ ত আমি সোজা ব'লে এলাম অসুখ সারবার একমাত্র ওষুদ হচ্ছে নতুন ক'রে প্রেমে পড়া।...আমার কথায় তপতী-দেবী শুধু হাসলেন!

—কি যে তুমি যা' তা' ব'লো, অসীম! আমি জানি কেন এই অসুখ হয়েছে। আমিই তপতীর এই অসুস্থতার কারণ।

—তা'ই যদি বুঝে থাকো তাহ'লে তুমিই গিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করো না কেন?..বেশ একটু তিক্তস্বরেই অসীম বলিল।

—তুমি ভাই রাগ ক'রো না, অসীম। আমি শুধু বলছি এই যে তপতীর সঙ্গে আমি দেখা করতে যাব, আমি জানি আমাকে দেখতে পেলে সে খুসী হবে! .বেশ খানিকটা দৃঢ়তার সহিতই সুবিনয় বলিল।

—তোদের মনের এই সব লুকোচুরী খেলা আমি বুঝি না, বুঝতে চাইও না।...তেমনই তিক্তস্বরে অসীম বলিল।...আমি শুধু এটুকু বলব, যা' করিস অগ্রপশ্চাৎ ভেবে করিস।...আবার যেন আমার কাছে এসে

হা'হুতাশ ক'রে বলিস্ না, ভাই অসীম, তোর সঙ্গে বিশেষ একটা পরামর্শ আছে!

—প্রয়োজন হ'লে তোমার সাহায্য যে নিতেই হবে আমাকে, অসীম।... বেশ যেন একটু আবদারের ভঙ্গীতেই সুবিনয় বলিল।...তোমার উপর অত্যাচার করছি যথেষ্ট, এবং ভবিষ্যতে আরও করব, শুধু এই ভরসায় যে তুমি সত্যি সত্যি রাগ করবে না কখনও।

—ঐখানেই ত আমার মুর্খামি।...এবার স্নিগ্ধস্বরেই অসীম বলিল।

—তাহ'লে কাজের কথা হোক্, অসীম।...তপতী সেই হস্টেলেই আছে ত?

—হ্যাঁ।

—অসুখের সময় তার কামরায় কি ডাক্তার ছাড়া অন্য কারোর প্রবেশ নিষেধ আছে নাকি?

—না, তবে রোগিনী যদি কাউকে না চায় তবে তার প্রবেশ নিষেধ নিশ্চয়ই।

—ওঃ, তাহ'লে সব ঠিক আছে।...বেশ খানিকটা আত্মনির্ভরের স্বরেই সুবিনয় বলিল।...আমি চল্‌লাম—কাল সব খবর দেব।

বলিয়া সুবিনয় অন্তর্হিত হইল এবং অবাক্ বিস্ময়ে অসীম তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

*
*   *

সুবিনয়ের বিবাহের সংবাদ তপতীকে দিয়া আসার পর অসীম ভাবিয়াছিল তপতীর সঙ্গে এই তাহার প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ। সুবিনয়ের প্রতি তপতীর প্রগাঢ় অনুরাগ এবং নিষ্ঠা দেখিয়া তাহার মনে যে ঈর্ষাময় চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল তাহাও দুই-একদিনের মধ্যেই স্থির হইয়া আসিয়াছিল। সে আবার ডুব দিয়াছিল তাহার রোগিরোগিনীদের পরিচর্যায় এবং তত্ত্বাবধানে।

কিন্তু অসীম চলিয়া যাওয়ার পর অবধি তপতী লজ্জিত বোধ

করিতেছিল। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকের কাছে সে যে সংযত ব্যবহার করিতে পারিল না, সুবিনয়ের বিবাহের সংবাদে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এজন্য সে নিজেকে বারে বারে তীব্র কশাঘাত করিতেছিল। তাহা ছাড়া, তাহার মনে হইতেছিল অসীমের প্রতি তাহার ব্যবহারটা বোধ হয় একটু অস্বাভাবিকরকম রূঢ় হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে সে স্থির করিল, অসীমের সঙ্গে আবার কথা বলিতে হইবে। তাহাকে দেখাইতে হইবে, সেই রাত্রির আবেগটা মোটেই সত্য নয়, সংযমে, দৃঢ়তায় সে কোনো অংশে কাহারও চেয়ে খাটো নয়। আর নিজের অভদ্রতার জন্য প্রকারান্তরে সে অসীমের ক্ষমাভিক্ষাও করিয়া নিবে।

রাত্রি নয়টা। অসীমের বসিবার ঘরের টেলিফোন্‌টা ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

—হ্যাল্লো। অসীম বলিল।

—আপনি ডাঃ রায়? তারের অপরপ্রান্ত হইতে প্রশ্ন হইল।

—হ্যাঁ, বলুন।

—আমি—আমি তপতী, মিস্‌ তপতী মিত্র।..

—ওঃ, হ্যাঁ.. বলুন।..বিস্ময়ের সহিত অসীম বলিল।

কি যে বলিবে তপতী ভাবিয়া পাইল না। যাহা বলিবে ভাবিয়া টেলিফোনের কাছে আসিয়াছিল তাহা যেন হঠাৎ গুলাইয়া গেল।

অসীম আবার বলিল, হ্যাঁ, বলুন মিস্‌ মিত্র..

অনেক কষ্টে তপতী বলিল, আপনাকে বিরক্ত করছি, ডাঃ রায়, কিছু মনে করবেন না।.. আপনি একদিন সময় ক'রে আমার কাছে আসতে পারবেন?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।...কখন আসব বলুন!

—আপনার যখন সুবিধা হয়।

—তাহ'লে কাল সন্ধ্যার পর যাব, কেমন?.. এই ধরুন সাতটা আন্দাজ। আপনি থাকবেন ত?

—হ্যাঁ, থাকব।...অজস্র ধন্যবাদ।

—নমস্কার।

নমস্কার।

টেলিফোনের রিসিভারটা রাখিয়া দিয়া অসীম ঘরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ তপতীর এই টেলিফোন করার কি অর্থ? কি কথা সে বলিতে চায়?

তপতী যাহাই বলিতে চাহিয়া থাকুক না কেন, তাহার সহিত যে আবার সাক্ষাৎ হইবে এই সম্ভবনায় অসীম হঠাৎ অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিল।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কয়েক মিনিট আগেই অসীমের গাড়ি তপতীর হস্টেলের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

তপতী তৈরী হইয়াই ছিল, মোটরের শব্দ শুনিয়া নিচে নামিয়া আসিল। স্মিতহাস্যে বলিল, একটু আগেই এসে পড়েছেন কিন্তু!

– তাই নাকি? তা' দেরি ক'রে আসার চেয়ে একটু আগে আসাই বোধ হয় ভাল, নয় কি?

– কোথায় যাবেন?...মোটরে ঢুকিতে ঢুকিতে তপতী বলিল।

যেখানে বলবেন।

—সেদিন যেখানে গিয়েছিলাম, বেশ নিরিবিলি জায়গাটা কিন্তু।... তপতী বলিল।

যথা অভিরুচি।...অসীম গাড়িতে স্টার্ট দিল।

আবার তাহারা আসিয়া নামিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের কাছে। এবার চাঁদের আলোতে পথঘাট অনেকটা দেখা যাইতেছিল, টর্চ জ্বালাইবার কোন প্রয়োজন হইল না।

ঘাসের উপর বসিয়া অসীম বলিল, এবার বলুন, কি ব্যাপার।

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে তপতী জবাব দিল, ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়, ডাঃ রায়। সেদিন আমি নিজেকে সংবরণ ক'রে নিতে পারিনি' এতটুকুও— আপনি বোধ হয় বাড়ি ফিরে গিযে আমার সম্বন্ধে যা' তা' ভেবেছেন!

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে অসীম বলিল, আপনি আমার প্রতি অবিচার করবেন না, তপতীদেবী। আমি আপনার সম্বন্ধে এতটুকুও যা' তা' ভাবিনি'

...আর ভাব্‌বই বা কেন?...বেশ যেন একটু গভীর ভাবেই অসীম বলিল।

—তাহ'লে কি ভেবেছেন, বলুন!..তপতী সোজা দাবী করিয়া বসিল।

বিপন্নভাবে অসীম জবাব দিল, এবার কিন্তু আপনি আমাকে মুস্কিলে ফেল্‌লেন! কি ভেবেছি তা' কি দু'এক কথায় বলা যায়!

—বেশ, দশপনর কথায়ই না হয় বলুন! নাছোড়বান্দার স্বরে তপতী বলিল।

অসীম তপতীর এই জেরায় বেশ একটু ঘামিয়া উঠিল। প্রশ্নটাকে এড়াইবার আর একটা প্রয়াস করিয়া বলিল, আপনার কৌতূহল কিন্তু অমার্জনীয়।

—কেন? যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না এই ভাব দেখাইয়া তপতী বলিল।

—আমি আপনার সম্বন্ধে কি ভেবেছিলাম তা' আপনার সম্মুখে কি বলা যায়? না, বলা উচিত?

—তার মানে, আপনি আমার সম্বন্ধে খুব বিশ্রী একটা ধারণা পোষণ করছেন নইলে বলতে এত সঙ্কোচ কেন?

অত্যন্ত কাতরভাবে অসীম বলিল, না তপতীদেবী, মোটেই তা' নয়। শুনতে যখন চাচ্ছেন, শুনুন। আমি ভেবেছিলাম, আপনার প্রতি সুবিনয মস্ত বড় অবিচার করেছে, যে অবিচারের বোঝা বহন করবার মত কোন অপরাধ আপনি করেননি'। সুবিনযের দিকটা আমি একেবারে উপেক্ষা করছি না (সেদিনও করিনি'), তবু আমার মনে হয়েছে, কেন এমন হয? আপনার জীবনে যে পথটি ছিল সেটিও সংক্ষিপ্ত, রুদ্ধ হয়ে গেল সুবিনয়ের কল্যাণে। কিন্তু এই কি হবে আপনার পরিণতি? আপনার মত বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা, রূপগুণে সম্পদশালিনী মেয়েও কি চলবে গতানুগতিক পথে? ভালবাসায় সফলতা পেলেন না ব'লে আপনিও হয়ে পড়বেন নৈরাশ্য বিহ্বল, আপনার প্রাণের আর সব কয়টি উৎস হয়ে যাবে স্তব্ধ, লুপ্ত?

অনেকখানি আবেগের সহিতই অসীম কথাগুলি বলিয়া ফেলিল।

সে আবার বলিয়া চলিল, হয়ত অনধিকার চর্চা করছি, তপতীদেবী, ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনি নিতান্ত জোর ক'রে জানতে চাইছেন ব'লেই এসব

কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।...আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি নিজেকে ফিরে পাবার চেষ্টা করুন। যা' শেষ হয়ে গেছে, তার দাবী নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে আপনি বেরিয়ে আসুন বিরাট এই পৃথিবীতে, নিজেকে বিলিয়ে দিন্ বিশ্বের অভিসারে।

অসীম নিজেই অবাক হইয়া যাইতেছিল কোন্ এক শক্তির প্রেরণায় সে এতগুলি কথা বলিয়া যাইতে পারিতেছে। কথা শেষ করিয়া সে তপতীর দিকে তাকাইল।

তপতী অনেকক্ষণ নতমুখে বসিয়া রহিল।

অসীম প্রশ্ন করিল, সুবিনয়ের সঙ্গে কি এর মধ্যে আপনার দেখা হয়েছে?

—না।

অসীম বিস্মিত হইল, কিন্তু বিস্ময় গোপন করিয়া বলিল, ভালই হয়েছে। আমি তাকে ব'লে দেব সে যেন আপনার সঙ্গে দেখা না করে, অন্ততঃ আরও কিছু দিন।

—না, না... আপনি অমন কথা কখনও বলবেন না।... অনেকটা আর্তস্বরে তপতী বলিয়া উঠিল।

—আপনি আমাকে ভয়ানক হৃদয়হীন ভাবছেন, তপতীদেবী, কিন্তু একটু চিন্তা ক'রে দেখুন, আমি যে কথাটা বললাম সেটা কি সত্যি সত্যি যুক্তিসঙ্গত নয়? আপনার এখন প্রয়োজন বিশ্রামের—আমি চাই না এই বিশ্রামের মধ্যে সুবিনয় এসে বন্ধ দরজায় শিকল নাড়ে।...দু'মাস, তিনমাস, চারমাস পরে যখন আপনি শান্ত, সুস্থ হয়ে উঠবেন তখন সে যতখুসী আসুক, আমি আপত্তি করব না, কিন্তু এখন নয়, অন্ততঃ আমি তাতে সায় দিতে পারি না!

ম্লান হাসি হাসিয়া তপতী বলিল, আপনি যে রীতিমত ডাক্তারি আরম্ভ ক'রে দিলেন, ডাঃ রায়!

—যদি একে ডাক্তারি বলতে চান বলুন, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি খুসী হ'ব যদি একে আপনি বন্ধুত্বের অত্যাচার ব'লে মনে করেন।

তপতী আবার চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ বলিয়া বসিল, সেদিন আপনার সঙ্গে বড্ড রূঢ় ব্যবহার করেছিলাম, ক্ষমা ক'রে নেবেন কিন্তু!

—রূঢ় ব্যবহার আপনি কিছুই করেননি', তপতীদেবী! তবু, আমি ক্ষমা করেছি বল্‌লে যদি আপনি খুসী হন্‌ তাহ'লে বল্‌ছি, সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করলাম।

রাত্রি গভীরতর হইয়া আসিল। পথে জনকোলাহল কমিয়া আসিতে লাগিল—দূরে ঝিল্লীর দুই-একটা শব্দও শোনা গেল।

—অনেক রাত হ'য়ে যাচ্ছে, এবার বোধ হয় আপনাকে হস্টেলে ফিরে যেতে হবে। অসীম বলিল।

সুপ্তোত্থিতের মত তপতী বলিল, অ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলাম এতখানি রাত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, চলুন

মোটরে আসিতে আসিতে তপতী বলিল, আপনার কথামত চলতে খুব চেষ্টা করব ডাঃ রায। কেবল একটি অনুরোধ, আমি বড্ড একা—আপনি মাঝে মাঝে আমার খবর নেবেন। আর আজকের এই প্রগল্‌ভতাও মার্জনা ক'রে নেবেন!

হাসিমুখে অসীম জবাব দিল, তথাস্তু।

ইহার পর প্রায় চার-পাঁচমাস কাটিয়া গিয়াছে। তপতী মাঝে মাঝে অসীমকে টেলিফোন করিয়াছে, কয়েকবার তাহারা একত্রে বেড়াইতে গিয়াছে, কোন রেস্তরায় যাইয়া চা' খাইয়াছে, একবার অসীম তপতীকে জোর করিযা সীনেমায় পর্যন্ত নিযা গিয়াছিল, কিন্তু কাজের ভীড়ে সে নিয়মিতভাবে তপতীর খোঁজ নিতে পারে নাই। তপতী দুই-একবার মৃদু অনুযোগ করিয়াছে, কিন্তু অসীমের কর্মব্যস্ততা দেখিয়া তাহাকে বিরক্ত করিতে সাহস

পায় নাই। অসীমও অনেকখানি নিশ্চিন্ত ছিল এই ভাবিয়া যে সুবিনয় আর তপতীর সঙ্গে দেখা করার প্রয়াস করে নাই এবং তপতীও সুবিনয়ের নাম (অন্ততঃ অসীমের সম্মুখে) উচ্চারণ করে নাই।

তপতী খুবই দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিতেছিল অসীমের উপদেশানুযায়ী মনটাকে নূতন সুরে বাঁধিতে। সুবিনয়ের সঙ্গে তাহার প্রেম যে যথার্থ প্রেম নয় ইহা সে নানা ভাবে ভঙ্গীতে নিজের মনকে বলিতে চেষ্টা করিত। আর যে প্রেমাস্পদ চার-পাঁচমাসের মধ্যেও তাহার পূর্বতন প্রিয়াকে দেখিতে আগ্রহান্বিত হয় না তাহা বন্ধুর উপদেশেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক তাহার সম্বন্ধে ভাবিয়া মনকে রক্তাতুর করিয়া রাখা যে কতখানি অগৌরবের বিষয় তাহাও সে উপলব্ধি করিতেছিল। কিন্তু তবু সে সুবিনয়কে ভুলিতে সমর্থ হইতেছিল না। এক একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে যখন হাওয়া দিত, আকাশেবাতাসে বসন্তের সৌরভ ছুটিত, তখন তাহার বুক ব্যথাতুর হইয়া উঠিত, তাহার কেবলই মনে হইত সে যেন কি অমূল্য একটা বস্তু হারাইয়াছে।..অসার্থকতার বেদনা তাহাকে মুহ্যমান্ করিয়া তুলিত, সে কেবলই ভাবিত, কি করিলে কোন্ কূলহারা কামনার ধারে সে নূতন করিয়া খুঁজিয়া পাইতে পারে তাহার পুরাতন ভালবাসাকে, ভালবাসার পাত্রটিকে।

অনেক দিন পর অসীম একদিন তপতীর কাছে আসিল। তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চমকাইয়া উঠিল।

বলিল, একি, তপতীদেবী, আপনার অসুখ করেছে নাকি?

কৈ, না ত!...তপতী জবাব দিল।

—আয়নায় আপনার চেহারাখানা একবার দেখেছেন কি?...বেশ রাগত-স্বরেই অসীম বলিল।

দেখেছি বই কি! আমার চেহারা ত আর তেমন সুশ্রী নয় যে বার বার তাকিয়ে থাকতে হবে।...পরিহাসের সুরে তপতী জবাব দিল।

—ঠাট্টা নয়, তপতীদেবী। আপনার নিশ্চয়ই অসুখ করেছে।... আপনাকে ভাল ক'রে আজ পরীক্ষা করতে হবে।

—না, না, এসব হবে না। লজ্জায় রাঙা হইয়া তপতী জবাব দিল।

—আমি ডাক্তার, আমাকে ডাক্তারের কর্তব্য করতে দেবেন না আপনি?

করুণস্বরে তপতী জবাব দিল, আমি বেশ ভাল আছি ডাঃ রায়, কেন আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন!

—আপনি ভাল আছেন কি নেই সেটা জানতে পারব আপনাকে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করবার পর। আপনার কোন আপত্তি আমি শুনব না! দৃঢ়স্বরে অসীম বলিল।

অগত্যা বাধ্য হইয়া তপতীর অসীমকে নিয়া যাইতে হইল নিজের ঘরে। সেখানে প্রায় আধঘণ্টা কাল অসীম খুব যত্নের সহিত তপতীর বুক-পিঠ পরীক্ষা করিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাকে জেরা করিল এবং অবশেষে বলিল আপনার নার্ভাস ডেবিলিটির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে লো ব্লাডপ্রেসার। এ ত মোটেই ভাল নয়!

—কি করতে বলেন আপনি? অসহায়ভাবে তপতী প্রশ্ন করিল।

—সুবিনয়কে ভুলতে পারেন নি' এখনও? সত্যি কথাটা বলুন ত! তীক্ষ্নভাবে অসীম প্রশ্ন করিল।

তপতী এবার বেমালুম মিথ্যা কথা বলিল।

—সুবিনয়ের কথা ভেবে আমি এতটুকুও মাথা ঘামাই না ডাঃ রায়।

এমন স্থির অকম্পিতকণ্ঠে তপতী কথাটা বলিল যে অসীম অবিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাহলে স্কুলে আপনার খাটুনি খুব বেশি হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী বিশ্রাম এবং খাওয়া আপনি পাচ্ছেন না।

সেটা হতে পারে।

—এর একটা প্রতিবিধান করা নিতান্ত দরকার তপতীদেবী। এভাবে বেশি দিন চললে আপনি একদিন একেবারে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়বেন যে! অসীমের কণ্ঠস্বরে রীতিমত উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইল।

—বলুন কি করতে হ'বে।

—আপনাকে ছুটি নিতে হ'বে। খাটুনী যতদিন চলবে ততদিন আপনার শরীর কিছুতেই সারবে না।

কাতরভাবে তপতী বলিল, কিন্তু ছুটি নিয়ে আমি কিভাবে সময় কাটাব, ডাঃ রায়? জীবন যে দুর্বহ হয়ে উঠবে অলস মুহূর্তের অত্যাচারে!...ছুটি না নিলে চলে না?

অসীম একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আপাততঃ না হয় ছুটি না নিলেন, কিন্তু আমার উপদেশমত খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রাম আপনাকে করতেই হবে, তাতে যেন অন্যথা না হয়।...যদি এমনিতেই শরীর সারে, ভাল কথা।

প্রায় দেড়মাসকাল তপতী অসীমের চিকিৎসাধীন রহিল। অসীম ইহার মধ্যে [illegible] অনেক ব্যবস্থাপত্র বদলাইল—তপতীও অত্যন্ত সুবোধ মেয়ের মত একটা বাঁধাধরা রুটিন অনুবর্তন করিল, কিন্তু তাহার শরীরের কোনই উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। অসীমের তিরস্কারের ভয়ে তপতী তাহার শরীরের উত্তরোত্তর খারাপ অবস্থা অনেক দিন পর্যন্ত চাপিয়া রহিল।

সেদিন অসীম তপতীকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া চিন্তিত মুখে বলিল, আপনার শরীর ত মোটেই সারছে না, তপতীদেবী!

—না, আমি ত বেশ আছি।...ক্ষীণকণ্ঠে তপতী বলিল।

—আপনি বল্‌লেই ত হবে না, তপতীদেবী। আমি ডাক্তার, আমার কাছ থেকে আর যা'ই লুকোতে চান, অসুখটা কিছুতেই লুকোতে পারবেন না!

তপতী চুপ করিয়া রহিল। অন্যমনস্কভাবে টেবিলের একটা পেন্সিল হাতে নিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

বেশ একটু তীব্রভাবেই অসীম বলিল, এ শুধু আপনার শরীরের অসুখ নয় যে ওসুদে সারবে।...এ রীতিমত মনের অসুখ, তপতীদেবী।

তপতী তবু কথা বলিল না।

কণ্ঠে আরও খানিকটা ভৎর্সনা এবং শ্লেষ মিশাইয়া দিয়া অসীম বলিল, আপনি যদি আপনার শরীর-মনের সব কথা নির্বিচারে আমাকে

খুলে না বলেন তাহ'লে আমাকে বিদায় নিতে হবে, তপতীদেবী!..আমি চোখ খুলে অসহায়ের মত আপনার এই পলে পলে শুকিয়ে যাওয়াটা আর দেখতে পারছি না

—আমি ত আপনার কাছে কিছুই লুকোই নি', ডাঃ রায়। প্রতিবাদের স্বরে তপতী বলিতে চেষ্টা করিল।

—নিশ্চয় লুকিয়েছেন। জোরগলায় অসীম বলিল। শুধু লুকিয়েছেন এমন নয়, সেটাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন আর একটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে!

তপতীর নীরবতা দেখিয়া অসীম কেমন যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। এ কি অসম্ভব রকমের দুর্বলচিত্ত এই নারী! যে পুরুষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া অন্যকে গ্রহণ করিয়াছে, শুধু গ্রহণ করিয়াছে নয়, সেই অপরার সঙ্গে পরম আনন্দে দিন কাটাইতেছে, এবং ঘুণাক্ষরেও যে তাহার কথা মনে করে না, তাহাকে না-পাওয়ার বেদনা এই নারী এতদিনেও কাটাইয়া উঠিতে পারিল না!

না, তাহারই মূর্খামি হইয়াছে। মেয়ে জাতটাই বুদ্ধিহীনা, আবেগের আবর্তে তাহারা ঘূর্ণিপাক খাইতেই ভালবাসে, বুদ্ধি দিয়া কোন অবস্থা বা মানুষকে পর্যালোচনা করার ক্ষমতা তাহাদের আদৌ নাই। তাহার প্রথম হইতে উচিত ছিল তপতীকে এড়াইয়া চলা -সে বাঁচুক-মরুক, হাসুক-কাঁদুক তাহাতে তাহার কি লাভ বা লোকসান?

সে উঠিয়া পড়িল। বলিল, চললাম।

ভীতা হরিণীর মত তপতী অসীমের দিকে তাকাইল। বলিল, আবার কবে আসবেন?

– আর আসব না। বেশ দৃঢ়স্বরে অসীম বলিল এবং প্রস্থানোদ্যত হইল।

তপতী আর সহ্য করিতে পারিল না। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করিয়া সে অজ্ঞান হইয়া এলাইয়া পড়িল।

তাহার যখন জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল, বিছানায় শুইয়া আছে,

জলের ঝাপ্‌টায় তাহার মাথার চুল, বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে এবং উৎকণ্ঠিত-ভাবে অসীম তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

—এখন একটু ভাল বোধ করছ, তপতী?..অসীম প্রশ্ন করিল।

তপতী তখনও অনেকটা মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছে, অসীমের এই নূতন সম্বোধন সে বোধ হয় লক্ষ্য করিল না। তবে লজ্জায় তাহার পাণ্ডুর মুখখানা রক্তাভ হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে অসীমের কাছে সে নিজেকে অবশেষে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। তাহার অস্বীকার, গোপনতার প্রয়াস একেবারে বিফল হইয়া গেল!

এদিকে অসীম অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করিতেছিল। তপতীর শরীর এবং মনের বর্তমান অবস্থায় তাহাকে এই প্রকার একটা শক্ দেওয়া যে একেবারেই উচিত হয় নাই তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তাহার উদ্বেল সহানুভূতি আবার তপতীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তুমি এখন বিশ্রাম করো, তপতী। ঘুমের কোন ওষুদ তোমাকে দেওয়া চলবে না, তবে তুমি অত্যন্ত শ্রান্ত হ'য়ে রয়েছ, ঘুম আসতে বেশি দেরি হবে না!

—আপনিও আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন না ত?...আবার ভীতকণ্ঠে তপতী বলিল।

সস্নেহে তপতীর হাতটির উপর একটি মৃদু চাপ দিয়া অসীম বলিল, পাগল! রাগের মাথায় তখন কি বলেছিলাম, সেটা ত আর সত্যি নয়।.. আর ত তোমাকে শুধু আমার রোগিনী ভাবছি না, এখন আমাকে তোমার বন্ধুর স্থান গ্রহণ করতে হবে, যাতে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো, নিঃসঙ্কোচে তোমার মনের কথা আমাকে খুলে বলতে পারো।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তপতী তাকাইয়া রহিল।

—আচ্ছা, এখন তাহ'লে আসি।...তোমার চাকরটা কাছেই রইল, যদি কোন প্রয়োজন হয় তাকে ডেকো।...তুমি চুপ ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি, লক্ষ্মীটি!

অসহায়া বালিকার মত তপতী বলিল, আপনার কথার আমি আর অবাধ্য হ'ব না, ডাঃ রায়!

পরের দিন অসীম তপতীর কাছে যাইয়া দেখিল রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামে অনেকখানি উপকার হইয়াছে। তপতী নিজেই উঠিয়া স্নান সারিয়া সুন্দর একখানা শাড়ী পরিয়া বসিয়া আছে, আর গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতেছে।

অসীম বলিল, আজ বেশ ঝর্‌ঝরে বোধ করছ ত তপতী?

হ্যাঁ ডাঃ রায়। ওষুদ ছাড়াই!

ওষুদ দিয়ে গিয়েছিলাম বই কি!

সে কি? কখন? বিস্মিতস্বরে তপতী প্রশ্ন করিল।

কেন এরই মধ্যে তুমি ভুলে গেলে! আমার বন্ধুত্বের ওষুদ!

ওঃ, এই ওষুদ! এ ওষুদ কি আপনি বরাবরই আমাকে দিয়ে আসছিলেন না ডাঃ রায়? তপতী বলিল।

- হয়ত দিচ্ছিলাম, তবে সজ্ঞানে নয়। কাল থেকে বুঝতে পেরেছি তোমার সঙ্গে দূরত্ব রাখলে চিকিৎসাটা মোটেই চলবে না তাই তোমাকে পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমাকে শুধু সাধারণ ডাক্তারের পর্যায়ে ফেলে রেখো না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই তপতী! শেষের দিকটায় অসীমের কণ্ঠে যথার্থ উৎকণ্ঠা এবং আবেগ ফুটিয়া উঠিল।

সে আমি জানি, ডাঃ রায়। তপতী বলিল এবং জানি ব'লেই ত এত নিঃসঙ্কোচে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছি আপনার হাতে!

– নিঃসঙ্কোচে হয়ত দিয়েছ, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়! অভিযোগের সুরে অসীম বলিল।

তপতী চুপ করিয়া রহিল।

--কথার লুকোচুরি ক'রে কোন লাভ নেই তপতী। অসীম বলিয়া চলিল। তুমি সুবিনয়কে ভালবেসেছ এবং তাকে ভুলতে পারছ না, এটা হচ্ছে প্রকাণ্ড সত্য এবং আমার তোমাকে চিকিৎসা করতে হবে এই সত্যটাকে গ্রহণ ক'রে, এটা উপেক্ষা ক'রে নয়। তাই আজ তোমাকে অভয় দিচ্ছি তুমি তোমার মনের কথা আমাকে নির্বিচারে খুলে বলতে পারো, আমি রাগ করব না।...যে অনুভূতিকে তুমি সমগ্র এবং সত্য ব'লে মনে করেছ তাকে জোর ক'রে তুচ্ছ ব'লে উপেক্ষা করায় কোনই সার্থকতা নেই, তপতী!

—আপনি ত সবই বুঝতে পেরেছেন, এখন আমাকে শাস্তিবিধান করুন!...মৃদুস্বরে তপতী বলিল।

—শাস্তিবিধান কিছুই করব না, তপতী! বরং আমি চেষ্টা করব যাতে সুবিনয়কে অন্ততঃ একবার তোমার কাছে এনে দিতে পারি।...তোমরা দু'জনে মুখোমুখি হ'য়ে একবার নিজেদের অবস্থাটা পর্যালোচনা কর, এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থা কি হ'তে পারে তা'ও স্থির ক'রে ফেল, তারপর আমি তোমার চিকিৎসা সুরু করব, কেমন?

বেদনাহত কণ্ঠে তপতী বলিল, আপনি মনে মনে আমাব উপর ভয়ানক রাগ করছেন, ডাঃ রায়!

ম্লান হাসি হাসিয়া অসীম জবাব দিল, রাগ করছি না, তপতী, তবে এটা ঠিক যে [illegible] ত্ববুদ্ধি বোধ করছি। বুঝতে পারছি না, কি ভাবে চললে কোন্ পথ অবলম্বন করলে তোমাকে সুস্থ ক'রে তুলতে পারব।

ইহার পরও তপতী কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অসীম তাহাকে বাধা দিয়াছিল। বলিয়াছিল, শরীরের এই অবস্থায় মানসিক বিশ্রামের অত্যন্ত প্রয়োজন এবং কি করা উচিত হইবে তাহা সে দুই একদিন পরে তাহার সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করিবে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সুবিনয় আসিয়া উপস্থিত হইল অসীমের কাছে। অসীমের সঙ্গে তাহার কি কথোপকথন হইল তাহা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়াছি।

অসীমের ফ্ল্যাট্ হইতে বাহির হইয়াই সুবিনয় সোজা ছুটিল তপতীর হস্টেলের দিকে।...তপতীর অসুখ, অথচ সে তাহার কোনই খোঁজ করে নাই, এতদিন! অনুশোচনার কশাঘাত সুবিনয়ের মনে অত্যন্ত তীব্রভাবে লাগিল। তপতীর কাছে সে ক্ষমাভিক্ষা করিবে। তাহার এই সুদীর্ঘ নীরবতা,

এই অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য সে নিজেই অত্যন্ত লজ্জিত, তপতী নিশ্চয়ই তাহাকে আরও লজ্জা দিবে না!

ইতিপূর্বে সে কখনও তপতীর ঘরে যায় নাই, তপতীর সঙ্গে তাহার যে সাক্ষাৎ এবং আলাপ ঘটিয়াছিল তাহার অধিকাংশই হইয়াছিল বাহিরে এবং ক্বচিৎ কদাচিৎ হস্টেলের ড্রয়িং রুমে। কিন্তু সে জানিত তপতীই হস্টেলের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, পরিচিতদের তাহার ঘরে যাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ নহে।

তবু সে সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে একটু ইতস্ততঃ করিল। একজন চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তপতীদেবী কোথায় আছেন এবং তাঁহার সঙ্গে দেখা হইতে পারে কিনা।

চাকরটি জবাব দিল যে তপতীদেবীর শরীর অসুস্থ তবে যদি বিশেষ কোন জরুরী দরকার থাকে সে খবর দিতে পারে এবং বাবু উপরে আসিয়া দেখা করিতে পারেন।

ছোট একটি স্লিপ্‌এ নিজের নাম লিখিয়া সে চাকরের হাতে দিল এবং নিচে অপেক্ষা না করিয়া চাকরের পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল।

তপতীর হাতে স্লিপ্‌টি চাকর সবেমাত্র দিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাহির হইতে সুবিনয় বলিয়া উঠিল, তপতী, আমি সুবিনয়, আসতে পারি?

আবেগে উত্তেজনায় তপতী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অবশেষে সুবিনয় আসিয়াছে, সুদীর্ঘ সাতমাস পরে আসিয়াছে! সে কোন প্রকারে নিজেকে সামলাইয়া নিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, হ্যাঁ, এসো- না, না, একটু পরে, দাঁড়াও আমিই আসছি

সুবিনয় আর অপেক্ষা করিল না, সোজা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

অর্ধশায়িত তপতীর পান্ডুর মুখখানা দেখিয়া তাহার পুরাতন ভালবাসা সত্যই আবার নূতন ছন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে শুধু একটি কথা বাহির হইল, তুমি বড় রোগা হ'য়ে গেছ, তপতী!

তপতী কি যে বলিবে বুঝিতে পারিতেছিল না। নূতন ধাবমান অবস্থা এবং ঘটনার চঞ্চল ভূমিকার সঙ্গে সে যেন তাল সামলাইয়া উঠিতে

পারিতেছিল না। একদিকে দুর্জয় অভিমান তাহাকে বলিতেছিল সুবিনয়কে প্রতিহত করাই হইবে সবচেয়ে গৌরবজনক ব্যবহার। অপর দিকে বহু দিনের প্রতীক্ষমান সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাহাকে প্ররোচিত করিতেছিল সুবিনয়ের বুকে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে, এমন কান্না যাহা সে বহুদিন কাঁদে নাই।

তাহার দ্বিধা সহজ করিয়া দিল সুবিনয় নিজে। গভীর স্নেহে সে তপতীর শীর্ণ ডান হাতখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, আমাকে ক্ষমা কর, তপতী!

এবার তপতীর আবেগ আর বাধা মানিল না। সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুবিনয়—বুদ্ধিমান সুবিনয়—তপতীর এই আবেগ প্রকাশে কোন বাধা দিল না। শুধু সস্নেহে সে তপতীর ডান হাতটি এক হাতে নিয়া অপর হাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া তপতী বলিল, আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি আর একেবারেই আসবে না!

লজ্জিত মুখ করিয়া সুবিনয় বলিল, তোমাকে দোষ দিতে পারি না, তপতী! যে অপরাধ আমি করেছি তারপর তোমার কাছে মুখ দেখাবার মত সাহস আমার ছিল না! অসীম আমাকে দু' একবার বলেছিল তোমার কাছে আসতে, নিজের মুখে আমার কথাগুলো তোমাকে বলতে, কিন্তু কিছুতেই আমি সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারি নি'! কতবার যে তোমাদের হস্টেলের দোরগোড়া দিয়ে চলে গেছি, ভেবেছি ঢুকে পড়ি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিধা সংশয় এসে আমাকে ক'রে তুলেছে ভীরু!

বাধা দিয়া তপতী প্রশ্ন করিল, তবে আজ যে এলে?

—আজ? অসীমের কাছে শুনলাম তোমার অসুখ।... তাই স্থির থাকতে পারলাম না, তপতী!

অবিশ্বাসের সুরে তপতী বলিল, কিন্তু অসুখ ত আমার আজকের নয়, সুবিনয়। এ অসুখ যে প্রায় দু' মাস ধ'রে চলেছে!

—আমি জানতাম না, তপতী। অসীমের সঙ্গে তিনচার মাস যাবৎ আমার দেখাই হয় নি'! বহুদিন পরে আজ গিয়েছিলাম তার কাছে—অবশ্য

তোমারই খবর নিতে। এবং তার কাছে আজই প্রথম শুনলাম তোমার অসুখের কথা!

—ডাঃ রায় বুঝি তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন?. সন্দিগ্ধস্বরে তপতী প্রশ্ন করিল।

—না, বরঞ্চ যতদূর মনে হ'ল সে চেয়েছিল আমি যেন তোমার কাছে না আসি। অবশ্য এর জন্য তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, কারণ প্রথমতঃ তোমার শরীর অসুস্থ, আমার এই হঠাৎ-আগমনে তোমার হয়ত শক্ লাগতে পারে এই ভয় হওয়া অসীমের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, সে নিশ্চয়ই আমাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখছে না—আমি যা' করেছি তার পরে!

প্রতিবাদ করিয়া তপতী বলিল, না, না, ঐখানে তুমি প্রকাণ্ড ভুল করছ, সুবিনয়। ডাঃ রায়ের মত উদারচরিত্র লোক আমি খুবই কম দেখেছি—ঘুণাক্ষরেও তিনি তোমার বিপক্ষে একটি কথা বলেন নি', বরং তিনি সব সময় চেষ্টা করেছেন তোমার আচরণের মধ্যে সঙ্গতি, সামঞ্জস্য খুঁজে বার করতে। তিনি তোমাকে খুবই স্নেহ করেন!

তপতীর কথাগুলি সুবিনয় বিশ্বাস করিল কি না বোঝা গেল না। প্রসঙ্গটা উল্টাইয়া নিয়া সে বলিল, এবার তোমাকে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ভাল হ'য়ে উঠতে হবে তপতী।

—লাভ? ম্লান হাসি হাসিয়া তপতী প্রশ্ন করিল।

জোরগলায় সুবিনয় জবাব দিল, লাভ? লাভ হবে এই যে তুমি আবার সেই আগেকার তপতী হ'য়ে উঠবে। আর আমি—আমি এবার তোমাকে আমার কাছ-ছাড়া হ'তে দেব না!

কথাটার তাৎপর্য বোধ হয় তপতী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে শুধু বলিল, ভাল হ'তে আমার ইচ্ছা নেই!

অনুনয়ের ভঙ্গীতে সুবিনয় বলিল, তুমি কি আমাকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারবে না, তপতী? জানি অপরাধ করেছি অনেক, কিন্তু আমাকে একবার 'সুযোগ দিও দু' একটা কথা বলতে। বিয়ে করেছি, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের ত্রুটিও হচ্ছে না, কিন্তু সুখী আমি হই নি'।

বলিতে বলিতে সুবিনয়ের কণ্ঠস্বর যেন গাঢ় হইয়া আসিল।

তপতী কোন কথা বলিল না।

নিজেকে একটু সামলাইয়া নিয়া সুবিনয় বলিল, তোমার এই হস্টেলে থাকা কিছুতেই চলবে না, তপতী। এখানে তোমার দেখাশোনা করবার কেউ নেই—তাছাড়া এখানকার আবহাওয়াটাই যেন কেমন ভারী, শ্রান্তিকর। তোমাকে অন্যত্র চলে যেতেই হবে!

—সেখানে কে আমার দেখাশোনা করবে শুনি?...তপতী বলিল।

—কেন, আমি।...তপতীর মুখে বিস্ময়ের ছায়া লক্ষ্য করিয়া সুবিনয় যোগ করিল, আর অসীমও তোমার খোঁজখবর নিতে পারবে!

—ডাঃ রায় ত এখানেও আসছেন। আজকাল প্রায় রোজই আসেন। কিন্তু তুমি কি ক'রে আমার তত্ত্বাবধান করবে?...একটু থামিয়া ইতস্ততঃ করিয়া তপতী বলিল, তোমার স্ত্রী আছে, সংসার আছে, আমার মত হতভাগিনীর কথা ভেবে তোমার সুখশান্তি তুমি বিসর্জন দিতে পার না, সুবিনয়!

বেশ একটু জোরের সহিত সুবিনয় বলিল, পারি কি না পারি সে আমি বুঝব। আসল কথা হচ্ছে এই, তোমাকে এই হস্টেল ছাড়তে হবে।

ক্ষীণকণ্ঠে তপতী বলিল, কিন্তু স্কুল থেকে আমাকে আর বেশি দিন ছুটি দেবে না, সুবিনয়, অন্ততঃ পুরো মাইনেতে কিছুতেই নয়! হয়ত এবার আমাকে চাকরী থেকে রীতিমত জবাব দিয়ে দেবে।...তোমার অসঙ্গত আবদারের প্ররোচনায় প'ড়ে আমি আমার জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায়টা ত বন্ধ ক'রে দিতে পারি না!

তপতীর কথায় মৃদু ভর্ৎসনার সুর।

সুবিনয় বলিল, তোমার শরীর আগে, না চাকরী আগে? এভাবে থাকলে তুমি আর ক'দিন চাকরী করতে পারবে, তপতী? না, আমি তোমার কোন কথা শুনব না।...তোমার জন্য ছোট একটা বাড়ির খোঁজ আমি কালই করতে আরম্ভ করব।

শ্রান্ত, দুর্বল তপতী আর কিছু বলিল না। সুদীর্ঘ সাতমাসের স্নেহরসশূন্য একাকী জীবন তাহাকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিয়াছিল, তাই আজ সুবিনয় যখন তাহার স্নেহ এবং আশ্বাসপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিল

তখন তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি কল্যাণ অকল্যাণ বিচার করিবার মত মনের স্থৈর্য এবং বল তাহার রহিল না।...সুবিনয় তাহার ভার গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, সে এই উপহার উপেক্ষা করিতে পারিবে না। নিজের বোঝা নিজে না বহিয়া অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও অন্য কাহারও ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সে একটু শান্তি, একটু লঘুতা অনুভব করিতে চায়। কি হইবে অসঙ্গতির কথা ভাবিয়া, কি প্রয়োজন তাহার সুবিনয়ের স্ত্রীব বিষয় নিয়া মাথা ঘামাইয়া?

মৃদুস্বরে সে বলিল, ডাঃ রায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তুমি যা ভাল বোঝ ক'রো।...আমি এসম্বন্ধে কিছুই ভাবতে পারছি না!

তাহার হাতটিতে বেশ জোরে একটু চাপ দিয়া সুবিনয় বলিল, এই ত লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা বলছ, তপতী। তোমাকে আর ভাবতে হবে না। অসীমের সঙ্গে কথা ব'লে সব বন্দোবস্ত শেষ ক'রে আমি আবার তোমার কাছে আসব—কাল কিংবা পরশু। .ততদিন তুমি ভাল হ'যে থেকো কিন্তু, কেমন?

অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে তপতী সুবিনয়ের দিকে তাকাইল। তাহার সেই আয়তদৃষ্টি দেখিয়া সুবিনয় আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। তপতীর কবোষ্ণ ওষ্ঠে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

সুবিনয় চলিয়া গেলে তপতী অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া রহিল। তাহারই কেবলই মনে হইতে লাগিল সুবিনয় তাহাকে এখনও ভালবাসে, বিপদের মুহূর্তে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে সে এখনও দ্বিধা করে না।. ভাবিয়াছিল তাহার জীবন বোধ হয় উদ্দেশ্যহীন তরঙ্গে ভাসিয়াই চলিবে, কিন্তু এখন তাহার মনে হইল, তীর বুঝি বা মিলিতেও পারে!

*

*   *

পরের দিন ভোরবেলা এক কাপ চা খাইয়াই সুবিনয় ছুটিল অসীমের কাছে। আগের দিন রাত্রিতে তপতীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ, তাহার প্রস্তাব এবং তপতীর সম্মতির কথা সে বিশদ্‌ভাবে খুলিয়া বলিল।

অসীম যেন একটু বিরক্ত হইল, অন্ততঃ তাহার কথার ভঙ্গীতে সুবিনয়ের তাহাই মনে হইল। বলিল, এসব উচ্ছ্বাসের অর্থ আমি বুঝতে পারছি না, সুবিনয়!

আহতস্বরে সুবিনয় বলিল, অর্থ আর কিছুই নয়, অসীম। অর্থ হচ্ছে এই যে আমি তপতীকে ভালবাসি এবং চাই সে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হ'য়ে ওঠে!

ব্যঙ্গ মিশ্রিত কণ্ঠে অসীম বলিল, এই বিরাট উপলব্ধিটা মাস সাতেক আগে হ'লে ভাল হ'ত না, সুবিনয়?

শ্লেষটা গায়ে না মাখিয়া সুবিনয় জবাব দিল, যা হ'য়ে গেছে তা' নিয়ে কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই, অসীম। যে ভুল ক'রে বসেছি তার প্রতিফল সারাজীবন ধরে আমাকেই ভুগতে হবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে এখনও ভুল করতেই থাকব, ভুল শোধরাবার সুযোগ এলেও তা' গ্রহণ করব না।

বেশ গম্ভীরভাবে অসীম বলিল, দেখ্‌, সুবিনয়, তোকে আজ যে কথাগুলো বলব তা' বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখবি।...কথা হচ্ছে এই যে এখন তুই আর একা নস্‌, উচ্ছ্বাসের বশে যা-খুসী-তাই করতে পারিস্‌ না। তোকে ভাবতে হবে তোর স্ত্রীর কথা, তোকে ভাবতে হবে তপতীর ভবিষ্যতের কথা।...তোর স্ত্রী যদি জানতে পায় তুই তোর পুরানো প্রিয়ার কাছে আবার আনাগোনা করছিস্‌ তাহ'লে তোদের জীবন কি গিয়ে দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছিস্‌ কি? দোটানার মধ্যে পড়ে তোর দিনগুলিও কি অসহনীয় হ'য়ে উঠবে না?...যে পথ তুই বেছে নিয়েছিস্‌, তাতে সুখ অসুখ যাই থাকুক না কেন, তোকে যেতে হবে সেই পথেই, যদি তুই যথার্থ শান্তি পেতে চাস্‌, যদি তোর কাম্য হয়ে থাকে তপতীর মঙ্গল, তোর স্ত্রীর মঙ্গল।

সুবিনয় বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না। অসহিষ্ণু আবদারে ছেলের মত বলিল, ভবিষ্যতের কথা এতখানি তলিয়ে দেখবার মত সময় বা স্পৃহা আমার নেই, অসীম। ভবিষ্যতের কথা ভেবে এতদিন যা' করেছি তাতে আমার কি লাভ হয়েছে, তুমিই ব'লো অসীম।...এবার আমি শুধু বর্তমানের কথা ভাবতে চাই—দেখা যাক্ এই নতুন পন্থা অবলম্বন ক'রে কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

—অর্থাৎ অন্ধভাবে নিজের খেয়াল চরিতার্থ করাটাই তোর কাছে এখন বেশি প্রীতিপ্রদ মনে হচ্ছে?

—পরিস্থিতিটাকে যদি তুমি এইভাবে বর্ণণা করতে চাও, আমি কোন প্রতিবাদ করব না।...আমি এসেছি তোমাকে শুধু অনুরোধ করতে যে তপতীকে অন্যত্র রাখবার ব্যবস্থা করলেও তুমিই তার চিকিৎসা করবে, কারণ তুমি তপতীর অসুখের ইতিবৃত্ত জানো, তা'ছাড়া আমি চাই না যে আমাকে-তপতীকে জড়িয়ে বাইরের লোকে যা' তা' কুৎসা রটায়!

শ্লেষের সহিত অসীম জবাব দিল, চমৎকার তোর দাবী, সুবিনয়!... তুই চাস্ তোরা যে-ভাবে-খুসী চলবি আর আমি পাশে থেকে তোদের নৈতিক নির্ভরের খোরাক জোগাব!...আমাকে দিয়ে এসব হবে না, কিছুতেই হবে না!

শেষের কথা কয়টি খুবই জোরের সহিত অসীম বলিল।

এবার সুবিনয় অন্য সুর ধরিল। অত্যন্ত অনুনয়ের সহিত সে বলিল, আমি জানি আমার সঙ্গে তুমি এবিষয়ে একমত হ'তে পারছ না, পারবে না, কিন্তু অন্ততঃ তপতীর কথাটা ভেবে তুমি রাজী হও। তার শরীরের এই অবস্থায় যদি তুমি তাকে ছেড়ে চলে যাও, তাহ'লে তার শরীর এবং মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া হবে তা' থেকে তাকে বাঁচানো একপ্রকার অসম্ভব হ'য়ে উঠবে, এ ত তুমি জানো!

অত্যন্ত কোমল একটা কোণে সুবিনয় আঘাত করিল। অসীম একটু থামিয়া বলিল, বেশ, আমি আবার তোর প্রস্তাবে রাজী হ'লাম, কিন্তু তোকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার মন কিন্তু কিছুতেই সায় দিচ্ছে না।

সুবিনয় অসীমকে জানিত, সে তাহার সতর্কবাণী গায়ে না মাখিয়া বলিল, তুমি আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে একটা বড় সুবিধা হবে এই যে

প্রয়োজন হ'লে তুমি আমাকে সাবধান ক'রে ব'লে দিতে পারবে—তিষ্ঠ ক্ষণকাল, পথিকপ্রবর!

অসীম হাসিল।

সুবিনয় সেদিন আর কলেজে গেল না। সারাটা দুপুর এবং বিকাল সে কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিল, ছোট একটা ফ্ল্যাট বা বাড়ির সন্ধানে। অবশেষে সন্ধ্যার একটু আগে কলিকাতার প্রায় উপকণ্ঠে তপনপুরে একটা বাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া সে গেল তপতীর কাছে।

তপতী উৎসুকভাবে সুবিনয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। আগের দিন সুবিনয় তাহার ওষ্ঠে যে চুম্বন মুদ্রণ করিয়া দিয়া গিয়াছিল তাহার স্পর্শ সে যেন তখনও অনুভব করিতেছিল এবং স্মৃতিতেই তাহার শরীরের শিরাউপশিরাগুলিতে রক্ত দ্রুততালে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুবিনয়ের প্রতি তাহার অভিযোগ অভিমান নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল, সে শুধু ভাবিতেছিল সুবিনয় তাহাকেই যথার্থ ভালবাসে, সে নিজেই ভুল করিয়াছিল, সময় থাকিতে সে তাহার দাবী জানায় নাই, জোর করিয়া সুবিনয়কে গ্রহণ করে নাই!

সুবিনয় বলিল, বাঃ, একদিনেই তোমাকে অনেকখানি সুস্থ মনে হচ্ছে, তপতী?

অকারণে তপতী রাঙা হইয়া উঠিল।

বলিল, কি যে বলছ!

—না, সত্যি, তপতী। আজ তোমাকে রীতিমত নতুন, সতেজ ব'লে মনে হচ্ছে! ভাবছি, এর কারণ কি হ'তে পারে!

তপতী মাথা নিচু করিল।

—যাক্, এখন কাজের কথাগুলো আগে ব'লে নেই। অসীমের সঙ্গে কথা ব'লে তাকে রাজী করিয়েছি! সে কি সহজে রাজী হয়—বলে, আমার এই সব প্রস্তাব এবং আয়োজন নাকি মুহূর্তের খেয়াল!

শঙ্কিতচোখে তপতী সুবিনয়ের দিকে তাকাইল।

সুবিনয় বলিয়া চলিল, আমি তাকে বল্লাম, মুহূর্তের খেয়াল এ

নয়—আমি আমার হারানো নিজেকে ফিরে পেয়েছি, তাই ভয় কেটে গেছে।... অবশেষে সে রাজী হ'ল।...আমি তারপর বাড়ির বন্দোবস্ত ক'রে তোমার কাছে এলাম!...কালই তোমাকে যেতে হবে, স্কুলে ছুটির দরখাস্ত ক'রে দাও, আর সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্‌কেও ব'লে দাও তুমি কাল চলে যাবে।

মৃদুকণ্ঠে তপতী প্রশ্ন করিল, কতদিনের জন্য?

—আপাততঃ দুই মাসের জন্য, প্রয়োজন হ'লে ছুটি বাড়াতে হবে।

—কালই যেতে হবে? দু'দিন পরে গেলে হয় না?

—না, শুভস্য শীঘ্রং।...এখানকার বদ্ধ আবহাওয়া থেকে তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাই। কল্‌কাতার ধোঁয়া, কোলাহল আর আবর্জনা থেকে অনেক দূরে প্রায় গ্রামেরই মত নির্জন জায়গায় একটি বাড়ি পেয়েছি। তোমার খুবই ভাল লাগবে।

ভীতভাবে তপতী বলিল, কিন্তু সেখানে আমি একা থাকব কি ক'রে?

—একা তোমাকে থাকতে হবে না, তপতী। তোমার চাকর সঙ্গে যাবে, আর বাড়িওয়ালার মালীও থাকবে। তাছাড়া আমি প্রায় রোজই তোমার খবর নেব, তোমার কাছে থাকব।

তপতী প্রশ্ন করিল না কিভাবে সুবিনয় প্রায় রোজই তাহার খবর নিবে, তাহার কাছে যাইয়া থাকিবে। তাহার কলেজ, তাহার স্ত্রী, তাহার নিজের বাড়ির দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যে তপতীকে কি করিয়া খাপ খাওয়াইয়া নিবে তাহা সম্পূর্ণভাবে সুবিনয়ের নিজস্ব দায়িত্ব। দায়িত্ব যখন সে গ্রহণ করিয়াছে তখন কর্তব্যে তাহার ত্রুটি হইবে না নিশ্চয়ই। সবচেয়ে তৃপ্তির কথা এই, অন্ততঃ দুইটা মাস তপতীকে আর নিজের কথা ভাবিতে হইবে না—সুবিনয় তাহার কথা ভাবিবে, সুবিনয় তাহাকে আদেশ করিবে, আর সে নির্বিচারে সেই আদেশ পালন করিয়া যাইবে। গভীর স্নিগ্ধতায় সে ডুবিয়া রহিল।

সেই রাত্রিতে সুবিনয় বিদায় গ্রহণ করিল তপতীকে অত্যন্ত সাংসারিক কতকগুলি উপদেশ দিবার পর। যাইবার সময় সুবিনয় আগের দিনের মত তাহাকে আদর করিল না সত্য, কিন্তু তপতী অনুভব করিল সুবিনয়ের প্রত্যেকটি নির্দেশে স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছে।

*

* *

যথাসময়ে তপতী তপনপুরে তাহার নূতন বাড়িতে আসিয়া উঠিল। সে দেখিল খুঁটিনাটি সব ব্যবস্থাই সুবিনয় করিয়া রাখিয়াছে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সুরু হইল নির্বিঘ্ন স্বাচ্ছন্দ্যে।

সবচেয়ে তাহার ভাল লাগিল শান্ত জনবিরল মাঠের মধ্যে অবস্থিত বাড়ীটি। কোন কোলাহল নাই, কলিকাতার জীবনের তাড়া নাই, চারিদিকে সবুজ গাছপালা, পাখীর কলরব, বুনো ফুলের মৃদু মিষ্টি গন্ধ। জীবনের প্রতি যে ঔদাসীন্য এবং নির্লিপ্ততা তাহাকে এতদিন প্রায় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার কঠিন আবরণ যেন খসিয়া পড়িল প্রকৃতির এই সস্নেহ স্পর্শময় সান্নিধ্যে।

সুবিনয় প্রশ্ন করিল, তুমি খুসী হয়েছ ত তপতী?

তপতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।...তাহার বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, তোমার পছন্দে আমার আস্থা জন্মেছে, সুবিনয়। তুমি আমাকে এখন যেখানে নিয়ে যাবে, যা' করতে বলবে, নিঃসন্দেহে নির্বিচারে বোধ হয় আমি মেনে নিতে পারব।

পরের দিন অসীমও আসিল। সুবিনয়ের এই বাড়ি পছন্দ করাকে সেও প্রশংসা না করিয়া পারিল না। তপতীকে সে বলিল, এবার তুমি শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর ভাল হ'য়ে উঠবে ব'লে আশা হচ্ছে, তপতী!

হাসিমুখে তপতী বলিল, আমিও আমাকে আপনাদের দু'জনের হাতে স'পে দিয়েছি, ডাঃ রায়। এবার আমি থাকব নীরব, শান্ত, আর আপনারা দু'জনে দেখাবেন আপনাদের কৃতিত্ব।...কিন্তু মনে রাখবেন আমার মেয়াদ কিন্তু মাত্র দু' মাসের, হেড মিস্ট্রেস্ আমাকে শেষবারের মত শাসিয়ে ব'লে দিয়েছেন, আর ছুটি মঞ্জুর হবে না!

—প্রয়োজন হ'লে সুবিনয় সে ব্যবস্থাও ক'রে নিতে পারবে। আর যা

কিছু দোষ তার থাকুক না কেন, খুব প্রশংসনীয় একটা জেদ যে ওর আছে তা' স্বীকার করতেই হবে।...অসীম বলিল।

সুবিনয় বেশ একটু খুসী হইল। অসীম এবং তাহার মধ্যে একটা যে বৈষম্যের প্রাচীর উ'চাইয়া উঠিতেছিল তাহা যেন অনেকখানি ভাঙ্গিয়া গেল।

—আচ্ছা, তাহ'লে আমি চল্‌লাম, তপতী। যতদূর মনে হচ্ছে আমার হপ্তায় একবার ক'রে এলেই চলবে, কারণ তোমার মন যতদিন খুসীতে ভরা থাকবে ততদিন ডাক্তারের প্রয়োজন হবে খুবই কম।...তবে কোন সময় শরীর খারাপ হ'লে সুবিনয়কে বলতে ভুলো না, আমাকে যেন খবর দেয়।

ঠোঁট ফুলাইয়া তপতী বলিল, তার মানে আপনি আমাকে একপ্রকার বর্জন করলেন!

ব্যস্ত হইয়া অসীম বলিল, আরে, না, না, বর্জন কি তোমায় করতে পারি তপতী, বিশেষ ক'রে যখন তোমার বন্ধুর আসন গ্রহণ করেছি! আমি ত সবসময়েই আশেপাশে রইলাম, প্রয়োজন হ'লেই ছুটে আসব, তাছাড়া রবাহূত ব'লে আমার একটু সুনামও আছে।...তবে যতদূর মনে হচ্ছে, আমাকে ডাকবার প্রয়োজন তোমার আদৌ হবে না।

বলিয়া তপতী বা সুবিনয় কাহাকেও কোন জবাব দিবার অবসর না দিয়াই অসীম পলায়ন করিল।

তপতীর কাছ হইতে নিজের ফ্ল্যাট পর্যন্ত সারাটা পথ অসীম কেবলই ভাবিতে লাগিল : মুক্তি, অবশেষে বুঝি বা সে মুক্তি পাইল! তপতী এখন খুসী হইয়াছে, সুবিনয় আসিয়া তাহার সমস্ত অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়াছে, ডাঃ র'য়ের চিকিৎসার এখন আর কোনই প্রয়োজন নাই! সুবিনয় যেভাবে তপতীর ভারগ্রহণ করিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন সে করে না, কোনদিন করিতেও পারিবে না, কিন্তু আজ তাহার কেন যেন মনে হইতে লাগিল, হয়ত সুবিনয় বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছে।...কি হইবে সংসারের আড়ষ্ট নিয়মকানুনের নির্দেশ মানিয়া, যদি অসীম তাহার পরোক্ষ অনুমোদন দ্বারা তপতীকে এতটুকু সুখী করিতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও অনুভব করিল যে তাহার আনন্দের অন্তরালে ছোট একটি ব্যথা, সামান্য একটু ঈর্ষাও যেন মাথা লুকাইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে।

জোর করিয়া এই অনুভূতিটি সে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল, নিজেকে তিরস্কার করিয়া বলিল, বোকামি করিস্ না!

অসীম চলিয়া যাইবার পর সুবিনয় বলিল, তপতী, সন্ধ্যা হ'য়ে এল, ঘরে এসো।

চকিতদৃষ্টিতে তপতী মাঠের দিকে তাকাইল। সত্যই বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, গাছের ছায়াগুলি দীর্ঘতর হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার মন আজ পূর্ণ, ঘরের বদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে ফিরিয়া যাইতে কিছুতেই ইচ্ছা করিতেছিল না।

সুবিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর অবধি সে তাহাকে তাহার ব্যক্তিগত জীবন, তাহার স্ত্রী, কলেজ, অন্যান্য কাজ সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন করে নাই। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, কিন্তু, সুবিনয়, আজ নিয়ে তুমি বোধ হয় তিন দিন কলেজ কামাই কর্‌লে, এ ভাবে ত প্রতিদিন চল্‌বে না!

—রোজ কলেজ কামাই করব না বটে, কিন্তু আমাকে তুমি রোজই পাবে, তপতী!...সুবিনয় জবাব দিল।

—সে কি? তোমার নিজের বাড়ি, তোমার, তোমার স্ত্রী?...শেষের দিকে তপতীর জিহ্বা কেমন যেন জড়াইয়া আসিল।

—সাত মাস বাড়ি এবং স্ত্রীর তত্ত্বাবধান করেছি, তপতী, এবার দু'টি মাস একটু বিশ্রাম নেব।

—তার মানে?...একটু যেন ভয়াতুর হইয়া তপতী প্রশ্ন করিল।

—মানে এই : কলেজ ফেরত বাড়ি না গিয়ে সোজা এখানে চলে আস্‌ব। তারপর যতক্ষণ তুমি আমাকে তাড়িয়ে না দাও তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করব।

—কিন্তু বাড়িতে তোমাকে ফিরে যেতেই হবে!

—তার যথেষ্ট সময় থাক্‌বে, তপতী। এখান থেকে কল্‌কাতার শেষ ট্রেণ হচ্ছে রাত সাড়ে দশটায়। তাছাড়া বাসও আছে। কেন, তুমি কি এখ্খুনি আমাকে চলে যেতে বল্‌ছ নাকি?

—কি যে যা' তা' তুমি বল্‌ছ!

—তাহ'লে তুমি চুপটি ক'রে বসে থাক, দেখি।...ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে না ত? একটা চাদর নিয়ে আস্‌ব?

—না।

বলিয়াই বেশ একটু দুষ্টুমিভরা চোখে তপতী সুবিনয়ের দিকে তাকাইল এবং তাকাইয়াই তাহার দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতে বাধ্য হইল। কারণ, সে দেখিল, তৃষিত চোখে নিষ্পলকভাবে সুবিনয় তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছে। গভীর প্রত্যাশায় মুখর সেই দৃষ্টি—তপতী কেমন যেন ভয় পাইল।

উঠিয়া পড়িয়া বলিল, সত্যি ঠাণ্ডা লাগ্‌ছে। চল, ঘরে যাই।

সুবিনয় তপতীর পশ্চাতে পশ্চাতে বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বসিবার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে অনুভব করিল, সুবিনয় আবার কেমন যেন অদ্ভুতচোখে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

অজানিত একটা শঙ্কায় তপতী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। বলিল, সুবিনয়, আজ সেই সকাল থেকে তুমি আমার কাছে রয়েছ, এবার বাড়ি যাও। তোমার ক্লান্ত লাগছে না?

আহতস্বরে সুবিনয় বলিল, অর্থাৎ আমার সঙ্গ এখন তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে?

—ছিঃ, ও কথা যে কতখানি মিথ্যা তা' তুমি জান। কিন্তু আমিও আজ বড্ড ক্লান্ত অনুভব করছি, শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ব।

বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়াই তপতী সুবিনয়কে স্টেশনে পাঠাইয়া দিল, সাড়ে সাতটার এক্‌স্‌প্রেসটা ধরিতে।

*

*   *

রেবা লক্ষ্য করিল স্বামী কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, কি একটা বিষয় যেন তাহার মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করিতেছে, সংসারের খুঁটিনাটিতে তাহার মন একেবারেই বসিতেছে না।

প্রশ্ন করিল, তুমি ক'দিন ধরে কি ভাব্‌ছ বলত?

সুপ্তোত্থিতের মত সুবিনয় জবাব দিল, কই, না, কিছুই ভাবছি না ত!'

অভিমানক্ষুব্ধস্বরে রেবা বলিল, ভাবছ না বললেই ত বিশ্বাস করতে পারি না! কোন্ এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে এই তিনটে দিন কাটিয়ে এলে, বাড়িতে ফিরে তোমার মুখখানা কেমন গম্ভীর, আমাকে একবারটি আদর করার কথা পর্যন্ত তোমার মনে হয় না!

ভুল শোধ্‌রাইবার প্রয়াস করিয়া সুবিনয় রেবাকে কাছে টানিয়া নিল, তাহার মুখখানা ধরিয়া একটি চুম্বনও আঁকিয়া দিল, কিন্তু রেবা অনুভব করিল স্বামীর এই আদর আজ যেন কেমন প্রাণহীন, নির্লিপ্ত।

সুবিনয় যে এ-কয়দিন কলেজ একেবারে কামাই করিয়াছে, রেবা জানিত না। সুবিনয় তাহাকে বলিয়াছিল কলেজ-ফেরত সে তাহার এক বহু দিনের পুরাতন বন্ধুর কাছে যাইবে, ফিরিতে দেরি হইতে পারে।

রেবা বলিল, আজ কিন্তু কলেজ থেকে সোজা বাড়ি ফিরতে হবে তোমাকে। আজ আর বন্ধুর বাড়িতে যাওয়া চলবে না।

একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সুবিনয় বলিল, দেখি, কলেজে গিয়ে তোমাকে জানাব।

স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া রেবা বলিল, দেখি বল্‌লে চল্‌বে না। বিকেলে আমরা সিনেমা দেখ্‌তে যাব। আজ যদি তুমি চলে না আস তা'হলে আমি ভয়ানক রাগ কর্‌ব কিন্তু!

ফলে, বাধ্য হইয়া সুবিনয়কে সেদিন বৈকালে বাড়িতে ফিরিতে হইল, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া রহিল তপতীর প্রতি। রেবার সঙ্গে সে

সিনেমায়ও গেল, কিন্তু সারা তিনটি ঘণ্টা সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিল।

রেবা কিন্তু তাহার এই অন্যমনস্কতা তেমন লক্ষ্য করিল না, করিলেও গায়ে মাখিল না। বাড়িতে ফিরিয়া স্বামীর চিত্ত-বিনোদন করিতে সে চেষ্টা করিল চিরন্তন-প্রথায়, আব্দার করিয়া বলিল, বাহিরে সুন্দর চাঁদ উঠিয়াছে, তাহার ইচ্ছা সে এবং সুবিনয় ছাদে যাইয়া বসে, তাহাদের প্রেমবিলাসের পুনরাবৃত্তি করে। সুবিনয় এবার বেশ একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল যে, তাহার মাথা ধরিয়াছে, ছাদে যাইয়া ছেলেমানুষি করার মত প্রবৃত্তি তাহার নাই।

স্বামীর রূঢ় প্রত্যাখ্যানে রেবা বেশ রাগ করিল। বলিল, বুঝেছি, আমাকে নিয়ে তোমার ক্লান্তি এসে গেছে, আমাকে আর ভাল লাগ্‌ছে না।

সুবিনয়ও রাগের সহিত জবাব দিল, সব সময় অসঙ্গত আব্দার আমার ভাল লাগে না, রেবা।

এই তিরস্কারে রেবার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে আর কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুবিনয়ও অনেকক্ষণ পর্যন্ত গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

এদিকে সুবিনয় চলিয়া যাইবার পর হইতে তপতীও ভাবিতে সুরু করিয়াছিল। সুবিনয়ের চোখে প্রত্যাশার আকুল যে দৃষ্টি সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার তাৎপর্য সে বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিল। আকারে ইঙ্গিতে সুবিনয় তাহাকে বলিয়াছে তাহার জীবন সুখের নয়, যাহাকে সে বিবাহ করিয়াছে, করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাকে সে ভালবাসে না, এবং অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে চিরদিন তপতীর ছবিই আঁকা রহিয়াছে।...তৃষিত মরুভূমি যেমন করিয়া বারিধারা নিঃশেষে শোষণ করিয়া নেয়, তেমনই আগ্রহে তপতী সুবিনয়ের এই কথাগুলি, এই ইঙ্গিতগুলি নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিয়াছে, বিশ্বাস করিয়াছে। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইয়াছে, কেন এমন হইল? কেন সে উপযুক্ত সময়ে জোরগলায় দাবী জানাইল না?...কি মূর্খতাই না সে করিয়াছে! সুবিনয় ত প্রথমে তাহারই কাছে প্রেম-নিবেদন

করিতে আসিয়াছিল, তখন যদি সে তাহাকে একটু অভয় দিত, যদি সে বলিত, করুন্ না সুবিনয়ের পিতা বিরুদ্ধাচরণ, তাহারা ভয় পাইবে না এতটুকু, তাহাদের সম্মিলিত ভালবাসা অকুণ্ঠিত নিষ্পলকনেত্রে সম্মুখীন হইবে পিতার এবং পরিবারের রোষকষায়িত দৃষ্টির। তাহা হইলে আজ জীবন কত সহজ ও সুখময় হইয়া উঠিত!...কিন্তু সে সুবিনয়কে সাহস দিল না এবং অনেকটা যেন ভয় পাইয়াই আহত সুবিনয় চলিয়া গেল পাহাড়ে, যেখানে অদ্ভুতভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মেয়েকে সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। এই প্রকার বিবাহ কি সুখের হইতে পারে? না, সুবিনয়কে কোনই দোষ দেওয়া যায় না, সে অত্যন্ত হতভাগ্য, তাই তাহাব জীবনে এইপ্রকার বিপর্যয় ঘটিয়াছে। আজ যদি সুবিনয় তপতীর নিকট হইতে একটু অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় পাইতে চায়, তবে কি তাহাকে রূঢ়ভাবে প্রতিহত করা উচিত হইবে?

ভাবিতে ভাবিতে তপতী কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানে না।

পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ পাঁচটার ট্রেণে তপতী সুবিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সুবিনয় আসিল না। পাঁচটার ট্রেণ, সাড়ে পাঁচটার ট্রেণ, সাড়ে ছয়টার ট্রেণ চলিয়া গেল, তপতী উন্মুখভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল, তবু না সুবিনয় নিজে আসিল, না সে পাঠাইল কোন সংবাদ! ক্লান্ত অবসন্ন মন নিয়া তপতী চেষ্টা করিল একটা সেলাইএ মনোনিবেশ করিতে, এমন সময় তাহার বুক পুলকচঞ্চল হইয়া উঠিল বাহিরে একটা গাড়ির শব্দে।

পর্দাটা তুলিয়া সুবিনয়কে অভ্যর্থনা করার জন্য তপতী অগ্রসর হইয়া আসিল, কিন্তু গাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল অসীম!

—আপনি, ডাঃ রায়?...বিস্মিতস্বরে তপতী বলিল।

—হ্যাঁ, কেন, আর কেউ আছে নাকি? অসুবিধায় ফেল্‌ছি না ত?

—না, না! তবে আপনি যে আবার আজই আস্‌বেন ভাবিনি! কালই, ত ব'লে গেলেন হপ্তায় একদিনের বেশি যেন আপনাকে আশা না করি,

আজই আবার আপনার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে একদিকে যেমন ভাল লাগছে আর একদিকে তেমনি আশ্চর্যও বোধ করছি।

—সুবুদ্ধি মোটেই নয়, খেয়াল!

—আপনি কখনও খেয়ালের বশে চলেন না, ডাঃ রায়।...আপনি লুকোচ্ছেন, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে কিছু বল্‌তে এসেছেন।

—বাঃ, আমার মুখের কথাটা বুঝি একেবারেই বিশ্বাস হ'ল না!... বেশ চলো, ঘরে বসে তোমার কাছে প্রমাণ করি আজকের আসাটা সত্যিই খেয়াল।

তপতীর পেছনে পেছনে অসীম ঘরে ঢুকিল।

—আজ সুবিনয় আসেনি'?...অসীম প্রশ্ন করিল।

—না, এলেন না কেন তাই ভাবছি, কারণ কাল ত এমন কথা বলেন নি' যে আসবেন না!

—আসবে না বলে নি' বলেই বুঝি বুঝতে হবে যে রোজই আসবে?

একটু লজ্জারুণ হইয়া তপতী বলিল, না, সেকথা বলছি না, তবে মনে হচ্ছে প্রকারান্তরে তিনি বলেছিলেন যে আজ আস্‌বেন.. ...

—আসে নি' ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলা দরকার।... অসীমের মুখখানা বেশ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

—বলুন।.. মৃদুকণ্ঠে তপতী বলিল।

—কথাটা খুবই ছোট্ট এবং সামান্য।...সুবিনয় তোমাকে হস্টেলের আবেষ্টনী থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, এতে আমি খুসীই হয়েছি, কিন্তু আমি চাই যে তুমি অন্ততঃ চারদিকে একটু নজর রেখে চলো।... সুবিনয়কে আমি এ সম্বন্ধে বলেছি, বিশেষ কোন সহযোগিতা তার কাছ থেকে আশা করি না, তাই তোমাকে বল্‌লাম।

—আমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছি না, ডাঃ রায়, আপনি কি বল্‌ছেন।

—এর মধ্যে বুঝ্‌বার বিশেষ কিছু নেই, তপতী। একটু ভেবে দেখ্‌লে তুমি অনায়াসে বুঝ্‌তে পারবে আমি কি বলতে চাই।...আচ্ছা, চল্‌লাম। পথে একটা কল্‌ সারতে হবে, দেরি করতে পারছি না।

বলিয়া যেমন আকস্মিকভাবে অসীম আসিয়াছিল, তেমনই আকস্মিক-ভাবে গাড়িতে যাইয়া উঠিল।

তপতী বিস্মিতভাবে তাকাইয়া রহিল।

ইহারও পরের দিন তপতী ভাবিতেছিল যে আজও যদি সুবিনয় না আসে তবে সে কি করিবে। তাহাকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছে সেখানে সে যে কত অসহায় তাহা অনুভব করিল সুবিনয়ের অনুপস্থিতিতে।

অসীমের হঠাৎ আসা এবং অযাচিত উপদেশের অর্থ সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। ডাঃ রায় তাহাকে স্নেহ করেন, তাহার বিপদের সময় তিনি যে সাহায্য করিয়াছেন সেই ঋণ সে কখনও পরিশোধ করিতে পারিবেনা, কিন্তু সুবিনয়ের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচ্ছন্ন অভিযোগ সে কিছুতেই ভালভাবে নিতে পারিতেছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, পৃথিবী যেন ষড়যন্ত্র করিতেছে তাহার মুখের গ্রাস হইতেই নবলব্ধ পরিতৃপ্তিটি কাড়িয়া নিতে। এবং সেই ষড়যন্ত্রের অন্যতম উদ্যোক্তা হইতেছেন ডাঃ রায়। যতই সে সুবিনয়ের গত দুই তিন দিনের ব্যবহারের কথা ভাবিতেছিল ততই সে তাহার পূর্বতন আচরণের সব কিছু অসঙ্গতির অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছিল এবং অদ্ভুত এক করুণায় সুবিনয়ের প্রতি তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গড়া আইনকানুনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাবও তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। কেন সে চিরকাল হইয়া থাকিবে অনাদৃত, অপাংক্তেয়? মাসের পর মাস চলিয়া যাইবে তাহাদের চিরন্তন শিহরণ নিয়া, আর সেই হইয়া থাকিবে অদ্ভুত, নির্বিকার, অনাসক্ত? .. তপতীর অজ্ঞাতে যে দিকটা ছিল এতদিন শূন্য, যেখানে প্রত্যাশা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল প্রায় নৈরাশ্যে, সেখানে সুরু হইল গোপন গুঞ্জরণ, শুষ্ক তরুশাখায় লাগিল পত্রপুষ্পের আঘাত।

পাঁচটার ট্রেণে সুবিনয় আসিল। তপতী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সুবিনয় আসিয়াই বলিল, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেছে, একটু চা তৈরি কর, তপতী!

—চা তৈরি করছি, তার আগে বরং একটু সরবৎ খাও।

নীরবে পরম আনন্দে সুবিনয় ঠাণ্ডা সরবৎ চুমুক দিয়া পান করিল। তাহার পর বলিল, কাল আসতে পারিনি', রেবা সব গোলমাল ক'রে দিল।

জিজ্ঞাসুনেত্রে তপতী তাকাইয়া রহিল। বুঝিল, সুবিনয় তাহার স্ত্রীর কথা বলিতেছে।

—দু'দিন সন্ধ্যায় বাড়ি যাইনি' ব'লে সে যা সীন্ করতে সুরু করল যে আমি ভাব্লাম, দূর হোক্‌গে ছাই, একদিন না হয তোমার কাছে নাই এলাম—যদি তাতে একটু শান্ত হয় । তারপর তার আব্দার হ'ল সিনেমায় যাবে, যেতে হ'ল এবং মাঝখান থেকে তীব্র মাথাধরা নিয়ে বাড়ি ফিবলাম। ...তোমাকে খবর দিতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু কি ক'রে দেব! এর পব স্টেশন মাস্টারবাবুর সঙ্গে ভাব ক'রে রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজন হ'লে তাঁর কাছে টেলিফোন কর্‌লে একটা মেসেজ্ অন্ততঃ তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

যথার্থ আশঙ্কার সহিত তপতী বলিল, কিন্তু সুবিনয়, এ যে অত্যন্ত একতরফা ব্যবস্থা হ'ল। আমার প্রয়োজন হ'লে আমি কি ক'রে তোমাকে খবর দেব?

চিন্তিতভাবে সুবিনয় বলিল, তুমি যা বলছ ঠিকই বটে।. একটা পন্থা বার করতেই হবে।..তবে আমার মনে হয় না তোমার বা আমাব কারোরই এরকম প্রয়োজন বেশি হবে। কাবণ, তোমার কাছে আমার আসায় ব্যাঘাত আমি আর সহজে হ'তে দেব না! প্রয়োজন হ'লে এই দুটো মাস আমি সোজা এখানে এসে থাকব।

সুবিনয়ের কথার মধ্যে বেশ খানিকটা দৃঢ়তার সুর বাজিয়া উঠিল।

—তারপর, কাল তুমি খুব নিরাশ হয়েছিলে, না তপতী?...

তপতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে একটু নিরাশ হইয়াছিল বই কি।

—আমার অবস্থা হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়। যার সংসর্গ তুমি কামনা কর না তার সঙ্গে যদি জোর ক'রে ভাব করতে হয় তাহ'লে কেমন লাগে একটু ভেবে দেখ দেখি। ইংরেজীতে বলতে ইচ্ছা হয়, আমাকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

বেচারী সুবিনয়! অত্যন্ত সহানুভূতির চোখে তপতী তাহার দিকে তাকাইল।

—আজ আমি ঠিক ক'রে এসেছি অনেকক্ষণ তোমার কাছে থাকব। শেষ ট্রেণটায় কল্‌কাতায় ফিরে যাব, তুমি আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রো কিন্তু!

তপতী সত্যই খুসী হইল এই ভাবিয়া যে একদিনের অনুপস্থিতির ক্ষতিপূরণ সুবিনয় করিতেছে পরের দিন ডবল সময় তাহার সঙ্গে কাটাইয়া। সে তৎক্ষণাৎ রান্নার আয়োজন করিতে ছুটিয়া গেল।

আধঘণ্টার মধ্যেই সুবিনয় আসিয়া দাঁড়াইল যেখানে তপতী চাকরকে সমস্ত জিনিস বুঝাইয়া দিতেছিল সেখানে। বেশ একটু অধৈর্যের সহিত বলিল, আমি বাইরে একলা বসে আছি, তপতী!

—এই এখ্‌খুনি যাচ্ছি।

সুবিনয় চলিয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে তপতী তাহার কাছে যাইয়া বলিল, বাব্বাঃ, কি অসম্ভব রকম অধীর লোক তুমি! এদিকে বলছ খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, আর ওদিকে ব্যবস্থা করতে একটু দেরি হ'লেই শাসানো হচ্ছে, আমি একলা বসে আছি কিন্তু!

—খাওয়াটা নিতান্তই গৌণ, তোমার সঙ্গে থাকা, গল্প করাটাই মুখ্য। এটা বুঝতে পারছ না, তপতী?

—বুঝেছি, খুব বুঝেছি।

—আমার কাছে এসে বসো, তপতী।

—এই ত কাছে বসেছি।

—না, আরও কাছে। চেয়ারটা এদিকে এগিয়ে নিয়ে এসো।

তপতী তাহার চেয়ারটা সুবিনয়ের চেয়ারের আরও সন্নিকটে নিয়া আসিল। সুবিনয় তপতীর ঘাড়ের কাছে তাহার বাঁ হাতটা দিয়া তাহার

মুখখানা নিজের গালের নিকটে টানিয়া নিয়া আসিয়া বলিল, তোমাকে দেখে কি মনে হয় জানো?

—কি?...তপতীর সর্বাঙ্গে শিহরণের একটা ঢেউ খেলিয়া গেল।

—মনে হয়, বিচ্ছেদের, দুঃখের মধ্য দিয়ে তোমাকে নতুন ক'রে পাব ব'লেই বোধ হয় তখন তোমাকে বিয়ে করতে আমার সাহস হয়নি'।...তখন যদি তোমাকে বিয়ে করতাম তাহ'লে তুমি হয়ত হয়ে থাকতে আমার কাছে অত্যন্ত সুলভ, আমাদের জীবন চলত গতানুগতিক ছন্দে। কিন্তু এখন, আমার এই সাতমাসের জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মুকুরে, আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি হচ্ছ সাধনার বস্তু, তোমাকে পেতে হ'লে কষ্ট করতে হয়।

—ছিঃ, অমন ক'রে ব'লো না।

—তুমি আমাকে ভালবাস, তপতী?

—কেন তুমি এ প্রশ্ন আজ করছ, সুবিনয়?...কাতরভাবে তপতী জবাব দিল।

—না, ভাবছি, কেন তুমি আমাকে এখনও ভালবাস। আমি কি করেছি যার জন্য আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য হ'তে পারি। হিসেবের খাতায় আমার বিরুদ্ধেই যে সবকয়টি অঙ্ক বসানো রয়েছে, তবু তুমি আমাকে ভালবাস?...সুবিনয় আবার প্রশ্ন করিল।

—কেন তোমাকে ভালবাসি তা' আমি সাতমাস আগেও তোমাকে বিশ্লেষণ ক'রে বলতে পারিনি', এখনও বলতে পারব না, সুবিনয়। শুধু এটুকু জানি যে আমি তোমাকে ভালবাসি এবং এই ভালবাসার স্রোতের মুখে তোমার ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি, দুর্বলতা অক্ষমতা সামান্য খড়ের কুটোর মত ভেসে যায়।...বলিতে বলিতে তপতীর গলার স্বর ভারী হইয়া আসিল।

ইতিমধ্যে চাকর আসিয়া খবর দিল, রান্না তৈয়ারী, জায়গা করিবে কি?

কথার মধ্যে বাধা আসিয়া পড়িল। সুবিনয় বলিল, আচ্ছা, খেয়েই নেওয়া যাক, খিদেও পেয়েছে।

তপতী কিছুতেই রাজী হইল না সুবিনয়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতে। আজ প্রথম সুবিনয় তাহার বাড়িতে অতিথি, সে কি অতিথির অভ্যর্থনা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে খাইতে বসিতে পারে?

খাওয়া শেষ করিয়া সুবিনয় তপতীকে বলিল সেও যেন তাহার আহারপর্বটা চুকাইয়া দেয়।

তপতী বলিল, সে পরে হবে'খন। তুমি ত দশটার মধ্যেই চলে যাবে—তারপর খাব।

সুবিনয় তপতীর কথা শুনিল না, জোর করিয়া তাহাকে খাইতে, পাঠাইয়া দিল।

আধঘণ্টা পরে তপতী ফিরিয়া আসিল। বলিল, কি মানে হ'ল সুবিনয়? মাঝখান থেকে আধঘণ্টা সময় কম পাব তোমার সঙ্গে কথা বলতে। সাড়ে-নয়টা বেজেছে, আর কয়েক মিনিট ত মাত্র হাতে রয়েছে!

—আমি আজ যাব না।...সুবিনয় বলিল।

—সে কি!...তপতী যেন আকাশ হইতে পড়িল।

—না, সত্যি আজ ফিরে যাব না। কাল ভোরের ট্রেণে চলে যাব।... তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, তপতী!...সুবিনয়ের কণ্ঠে কাতরতা ফুটিয়া উঠিল।

—কিন্তু, তুমি কোথায় শোবে? আর আমার চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাব্‌বে?

অসহিষ্ণুকণ্ঠে সুবিনয় জবাব দিল, চাকর-বাকরেরা কি ভাব্‌বে, বাবা কি ভাব্‌বেন, বন্ধুরা কি ভাব্‌বে, সারাটা জীবন ত কেবল সকলের ভাবনাকেই সমীহ ক'রে এলাম, এবার একটু নিজের ভাবনা ভাব্‌তে চাই। আমার আজ ভয়ানক ইচ্ছে করছে তোমার কাছে থাকতে। লক্ষ্মীটি, বারণ ক'রো না। তোমার চাকর-বাকরদের ব'লো তারা যেন কাজকর্ম সেরে তাদের নিজেদের ঘরে চলে যায়, আমার চলে যাবার জন্য অপেক্ষা না করে।

তপতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, সত্যি তুমি খুসী হবে যদি আজ তোমাকে এখানে থাকবার অনুমতি দেই?

—হ্যাঁ, সত্যি, খুবই সত্যি।...সুবিনয়ের চোখেমুখে অস্বাভাবিক একটা উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল।

তপতী তাহার চাকরকে জানাইয়া দিল যে সুবিনয়বাবুর যাইতে দেরি হইবে, কাজকর্ম শেষ করিয়া সে যেন নিজের ঘরে চলিয়া যায়।

তাহার পর আসিয়া সুবিনয়ের কাছে বসিল এবং বলিল, তাহ'লে এই বসবার ঘরের চৌকিটার উপরই তোমার শোবার ব্যবস্থা করি, কি বল?

—যেখানে তোমার অভিরুচি, তপতী। তোমার কাছে থাক্‌বার অনুমতি যে পেয়েছি এটাই আমার পরম লাভ।

—অনুমতির অমর্যাদা ক'রো না কিন্তু!...একটু হাসিয়া তপতী বলিল।

রাত্রি এগ্যারোটারও বেশি। বসিবার ঘরে সুবিনয়ের জন্য চলনসই-গোছের একটা বিছানা করা হইয়াছে, সুবিনয় সেখানে অর্ধশায়িত অবস্থায় তপতীর সঙ্গে গল্প করিতেছে। তপতী তাহার নিকটে একটা মোড়ার উপর বসিয়া কথা শুনিতেছে এবং দুই-একটি প্রশ্ন করিতেছে।

—তুমি তোমার স্ত্রীর কথা আমাকে একদিনও বলোনি' কিন্তু! একটু আগে তোমার একটা কথার মধ্যে শুধু তার নামটা জানতে পেরেছি!

—তুমি ত কখনও প্রশ্ন করোনি', তপতী!...আর কিইবা বলবার আছে? দেখতে শুনতে বোধ হয় খারাপ নয়, বয়স তোমার চেয়ে অনেক কম, স্বামীকে সে ভক্তি করে, হয়ত বা ভালওবাসে, কিন্তু আমাব মন তাতে এতটুকু ভরে না!

—কেন?

—কেন তা' কি তুমি বুঝতে পারছ না, তপতী? আমার মন যে পড়ে আছে তোমার দিকে।...সংসার, স্ত্রী, বাবার প্রতি একশ' রকমের ছোটখাট কর্তব্য ক'র্‌তে কর্‌তে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, আমি এখন এদের বন্ধন থেকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অব্যাহতি চাই, আমি চাই সম্পূর্ণভাবে তোমার কাছে থাকতে, তোমাকে ভালবাসতে, তোমার ভালবাসা পেতে!

বলিতে বলিতে সুবিনয় যেন আরও মুখর হইয়া উঠিল।

তপতী জবাব দিল, আমার ভালবাসা যে তুমি পেয়েছ সে ত তোমার অজানা নেই!

অসহিষ্ণুভাবে সুবিনয় বলিল, তোমার মুখের ভালবাসাতে আমি সন্তুষ্ট হ'তে পারছি না, তপতী।...কেন আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পাব না বলতে

পারো? তুমি বলছ তুমি আমাকে ভালবাস, কিন্তু কেন তোমার এই সঙ্কোচ, এই প্রতিরোধ? পরশ্‌দিন তুমি আমাকে বাড়ি থেকে একরকম তাড়িয়ে দিলে, আজও একটু আগে তুমি আমাকে বল্‌লে তোমার অনুমতির অমর্যাদা যেন না করি, কেন তুমি আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছ, তপতী?

সুবিনয়ের কথার শেষের দিকটায় আবার একটা অসহায়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে তপতী জবাব দিল, তুমি এমন অধীর হ'য়ে উঠো না, সুবিনয়। আমি যদি তোমাকে একটু প্রতিহত ক'রে থাকি সেটা করেছি, প্রথমতঃ, সমাজের চোখে নিজেদের বাঁচিয়ে চলবার জন্য, দ্বিতীয়তঃ, যাতে খেয়ালের বশে কোন একটা কাজ ক'রে তুমি পরে অনুতাপ না কর।...আমাকে বিশ্বাস ক'রো, আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে, নিবিড়ভাবে ভালবাসি, এবং এর অর্থ এই যে তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই!

বলিয়া লজ্জারুণ হইয়া তপতী মাথাটা নিচু করিল।

সুবিনয় তপতীকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া নিল। তাহার কবোষ্ণ ওষ্ঠে, কপোলে, চিবুকে গভীর স্নেহে চুম্বন করিতে লাগিল। তপতী কোন বাধা দিল না—নীরবে সুবিনয়ের আদর উপভোগ করিতে লাগিল।

একটু পরে সুবিনয় খানিকটা শান্ত হইলে তপতী বলিল, এবার বিশ্বাস হয়েছে ত? এখন ছেড়ে দাও!

সুবিনয় বলিল, খানিকটা বিশ্বাস হয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি'।... তুমি ছাড়া পেতে চাচ্ছ কেন, তপতী? যদি সত্যি আমাকে ভালবেসে থাক তাহ'লে আরও নিবিড়ভাবে, আরও পূর্ণরূপে আমার কাছে ধরা দিতে তোমার এত সঙ্কোচ কেন?

প্রতিবাদের সুরে তপতী বলিল, না, না...সে হয় না!

আগ্রহান্বিতস্বরে সুবিনয় বলিল, কেন হয় না? তুমি সমাজের শাসনকে বড় ক'রে দেখছ আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে? নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে আমাকে বলো, সত্যি কি তুমি চাও না আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি?...নিজেকে বঞ্চনা ক'রো না, তপতী!

ইহার কি জবাব তপতী দিবে? কেমন করিয়া সে সুবিনয়কে

বুঝাইবে তাহার জীবনের যে দিকটা ছিল শূন্য, নৈরাশ্যমণ্ডিত, সেখানে এতদিন পরে সুরু হইয়াছে গোপন গুঞ্জরণ, শ্যামল দূর্বাদলে ভরিয়া উঠিয়াছে সেই অববাহিকা! সত্য সত্যই তাহার কোন কুণ্ঠা, কোন দ্বিধা নাই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সুবিনয়ের কাছে তুলিয়া ধরিতে, কারণ সে অনুভব করিতেছে অপরূপের আলো, আকাশবাতাসকে মুক্ত করিয়া খসিয়া পড়িয়াছে পৃথিবীর চারিপাশের দিগ্বলয়।...তবু, তবু...

সুবিনয়ের কথাগুলি তাহার কাণের কাছে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।...আবার বল্‌ছি, তপতী, নিজেকে বঞ্চনা ক'রো না। সত্যি যদি অনুভব ক'রে থাক আমাকে তুমি ভালবাস, তোমার সমস্ত শরীর মন দিয়ে ভালবাস, তাহ'লে সেটার প্রকাশ দেখাতে ভয় পেয়ো না! আর আমার কথা? আমি তোমাকে আবার বলছি আমি একমাত্র তোমাকেই ভালবেসেছি।

সুবিনয়ের এই আকুল আহ্বান আর বেশিক্ষণ শোনা চলিবে না-- শুনিলে সে পাগল হইয়া যাইবে।...না, না, সুবিনয় কেন অন্যদিনের মত কলিকাতায় ফিরিয়া গেল না, কেন সে জোর করিয়া তপতীর কাছে থাকিয়া গেল?

রাত্রির মধ্যেও বোধ হয় একটা মাদকতা আছে। দিনের প্রখর আলোয় যাহা স্পষ্ট করিয়া দেখা যায়, রাত্রির অন্ধকারে তাহা হইয়া ওঠে অস্পষ্ট, অপরূপ।...অনভ্যস্ত আবেগে তপতীর শরীর শিহরিয়া উঠিল, তাহার চিন্তা-স্রোত রোধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল, তাহার মুগ্ধ চেতনা নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিল লুব্ধ আসক্তির প্রবাহে—নিঃসন্দেহে, নির্বিচারে।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তপতীর যখন খানিকটা চেতনা হইল তখন সে অনুভব করিল শুধু একটা স্নিগ্ধ তৃপ্তি।...মন্ত্রাহতের মত সে সুবিনয়ের ওষ্ঠে অতি সন্তর্পণে একটি চুম্বন আঁকিয়া দিল, তাহার দিক হইতে সুবিনয়কে এই প্রথম চুম্বন।

*
*   *

ভোরের আলো তপতীসুবিনয় উভয়কেই ফিরাইয়া আনিল রূঢ় বাস্তব জগতে। রাত্রির অন্ধকারে তাহারা দেখিয়াছিল ভালবাসার শুধু একটা দিক্, যে দিক বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে ভরপুর করিয়া আনে নরনারীর চিরন্তন কামনা। কিন্তু আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা সম্মুখীন হইল জীবনের নিষ্করুণ প্রবাহের।

মুখ দিয়া ভাষা ফুটিল না, কিন্তু তপতীর মনে কেবলই প্রশ্ন হইতে লাগিল, ইহার পর? আর সুবিনয়ও ভাবিতে লাগিল, এখন?

দুইজনের চিন্তাধারা একই পথে প্রবাহিত হইলেও খানিকদূর যাইয়াই তাহারা পৃথক গতি অবলম্বন করিল। ভবিষ্যতের কথা বারবার মনে হইলেও গত রাত্রির ঘটনার জন্য তপতীর মনে কোনই ক্ষোভ বা অনুশোচনা ছিল না। যদিও সে প্রথমে সুবিনয়কে প্রতিহত করিতেই চাহিয়াছিল, যদিও তাহার বুদ্ধি তাহাকে বারবার প্ররোচনা দিয়াছিল তাহার ভালবাসা যেন দৈহিক সাহচর্যের পর্যায়ে উপনীত না হয়, তবু সুবিনয়ের কাছে সে যখন পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিল তখন তাহার শরীর বা মনের মধ্যে অশুচির কালিমা এতটুকু স্পর্শ করিল না, বরং সে অনুভব করিল তাহার নারীত্ব সার্থক হইয়াছে, ভীরু সংকুচিতা তপতী মরিয়া নূতন এক তপতী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু সুবিনয় অপরাধের অনুভূতিটা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আবেগের প্রবাহে, আসক্তির আবর্তে নিজেকে ঢালিয়া দেওয়াটা সঙ্গত হয় নাই।...সে রেবার প্রতি অবিচার করিয়াছে, তপতীকেও সে যথোপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

মনের এই নূতন লীলাচঞ্চলতার কথা সে তপতীকে বলিল না। শুধু বলিল, বাড়ি হ'য়ে তারপর কলেজে যেতে হবে, তপতী। আর দেরি না ক'রে এখনই চলি।...

তপতী কোন বাধা দিল না। তাহার মন তখনও স্নিগ্ধ স্বপ্নে ভরপুর।

স্বামী গৃহে পদার্পণ করিতেই শুষ্ক উদ্বিগ্ন মুখে রেবা ছুটিয়া আসিল। বলিল, কাল তুমি সারা রাত কোথায় ছিলে গো? আমার উপর রাগ ক'রে কি এত বড় শাস্তি দিতে হয়?

বলিতে বলিতে রেবা কাঁদিয়া ফেলিল।

লজ্জিতভাবে সুবিনয় জবাব দিল, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম, রেবা। তোমাকে খবর দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু যখন খেয়াল হ'ল তখন বাস-ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে!...তোমার উপর রাগ ক'রে খবর দেইনি' এটা সত্যি নয়।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে রেবা বলিল, আমার সারা রাত ঘুম হয়নি'! কেবলই ভাবছিলাম কোথাও কোন অ্যাক্সিডেণ্ট হ'ল কিনা!

স্ত্রীকে আদর করিয়া সুবিনয় বলিল, আর কখ্খনো এরকম হবে না রেবা, প্রতিজ্ঞা করছি। যদি কখনও দেরি হবার সম্ভাবনা থাকে তোমাকে আগেই জানিয়ে যাব। যাও, আমার খাবার ব্যবস্থাটা ক'রে ফেল দেখি, আমি ততক্ষণ দাড়ি কামিয়ে স্নানটা সেরে নেই।

অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া রেবা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

সুবিনয় কলেজে যাইবার সময় রেবা মিনতি করিয়া (দাবী জানাইবার মত সাহস সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল) বলিল আজ যেন স্বামী কলেজ হইতে সোজা বাড়িতে ফিরিয়া আসে। সে বাহিরে কোথাও যাইতে চায় না,—সে শুধু চায় স্বামীর সান্নিধ্য, সাহচর্য যাহা কয়েকদিন ধরিয়া একপ্রকার দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনেকটা খুসী মনেই সুবিনয় প্রতিশ্রুতি করিল সে সোজা বাড়িতে চলিয়া আসিবে। আজই আবার তপতীর সম্মুখীন হইতে সে যেন কেমন একটা সংকোচ অনুভব করিতেছিল। আর এদিকে রেবার সস্নেহ অনুরোধও যেন অপেক্ষাকৃত মধুর লাগিতেছিল।

প্রতিশ্রুতিমত বৈকাল সাড়ে-পাঁচটার মধ্যেই সুবিনয় গৃহে ফিরিল। দেখিল স্নান করিয়া নূতন একখানা শাড়ী পরিয়া এবং সীমন্তে ও কপালে সিন্দুরের উজ্জ্বল রেখা টানিয়া রেবা তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সুবিনয়ের প্রশংসমান মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, আজ তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে, রেবা!

লজ্জায় পুলকিত হইয়া রেবা জবাব দিল, তবু আমাকে লক্ষ্য করবার সময় হ'ল! অন্যান্য দিন ত তোমার নজরই এদিকে আসে না!

—তোমাকে কয়দিন বড্ড অবহেলা করেছি, রেবা। বন্ধুর দাবী স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যকেও ছাপিয়ে উঠেছিল, অপরাধ স্বীকার করছি!

—ওঃ, আমার প্রতি বুঝি তোমার শুধু কর্তব্য!...অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া রেবা বলিল।

—আবার রাগ করলে, রেবা! নাঃ, তুমি ভারী বোকা!..বলিয়া সুবিনয় রেবাকে কাছে টানিয়া আনিয়া অনেক আদর করিল।

নীরবে আনন্দে রেবা স্বামীর আদর উপভোগ করিতে লাগিল।... খানিকক্ষণ পরে সুবিনয় একটু শান্ত হইলে বলিল, তুমি আজকাল কেমন যেন অদ্ভুত হ'য়ে গেছ! মাসের মধ্যে পনরদিন আমাকে অবহেলা কর, আমি তোমার স্ত্রী যে তোমারই বাড়িতে তোমার আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেখতেই পাও না, আবার এক একদিন হঠাৎ আমার প্রতি তোমার ভালবাসা এত শাখাপল্লবিত হ'য়ে ওঠে যে তোমার উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাল রাখা আমার পক্ষে কঠিন হ'য়ে ওঠে!...

—আমি তোমাকে সত্যি খুব ভালবাসি, রেবা!

—ছাই ভালবাস!...মুখে প্রতিবাদ করিলেও সুবিনয় অনুভব করিল রেবা তাহার কথাটা অবিশ্বাস করে নাই।

—তুমি বুঝতে পারছ না। বিয়ের প্রথম কয়টা মাসের তীব্রতা, আবেগ সমান তালে চিরদিন চলতে পারে না, রেবা। জোয়ারের পর ভাঁটা আসবেই, কিন্তু তার মানে এই নয় যে স্রোতস্বিনী মরে গেছে।...তোমার প্রতি আমার ভালবাসা, যা' মন্ত্র সাক্ষী ক'রে স্বীকার করেছি, তা' ফল্গুনদীর মত চিরদিনই ব'য়ে চলবে!

প্রতিবাদের সুরে রেবা বলিল, মন্ত্র সাক্ষী ক'রে তুমি ত স্বীকার করোনি' যে তুমি আমাকে ভালবাস! তুমি শুধু বলেছ তুমি আমাকে

গ্রহণ করলে, আমার ভরণপোষণের দায়িত্ব তোমার!...ভালবাসতে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি!

বলিয়া বিজয়িনীর মত সে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল।

রাত্রি দশটা। সারা সন্ধ্যায় রেবা যে প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহা সুবিনয়ের বেশ ভাল লাগিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল তপতীর কথা। তপতী কখনও সুবিনয়ের ভালবাসায় সন্দেহ প্রকাশ করে নাই, অন্ততঃ মুখে নয়। সে নীরবে সুবিনয়ের আশ্বাস বাণী গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ব্যবহারের মধ্যে যতই অসঙ্গতি থাকুক না কেন, তাহা নিয়া সে (তপতী) মাথা ঘামায় নাই। বরং সুবিনয় তপতীব প্রতি অভিযোগ করিয়াছে, তাহার (তপতীর) ভালবাসার গভীরতা নিযা হয়ত তাহাকে নির্যাতনও করিয়াছে! পলকের জন্য সুবিনযের মনে প্রশ্ন জাগিল, তপতী যে সুবিনয়ের কাছে নিঃশেষে ধরা দিয়াছে তাহা তাহাব এই অভিযোগ এই নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপে নয় ত?

স্বামীকে অন্যমনস্ক দেখিযা রেবা প্রশ্ন করিল, কি গো, কি ভাবছ?

সুপ্তোত্থিতের মত সুবিনয় জবাব দিল, কৈ, না, কিছু ভাবছি না ত!

রেবা আবার স্বামীর বুকে মাথা বাখিল। বলিল, তুমি আমাকে ভাল না বাসলেও আমি তোমাকে খুব ভালবাসি গো!

—জানি, রেবা।. গাঢ়কণ্ঠে সুবিনয জবাব দিল।

—তবু ত আমাকে দু'চোখে দেখতে পাব না! আমাকে কেবল এড়িয়ে চলো! রেবার চক্ষু আবার জলে ভরিযা আসিল।

—না, গো, না। আমি তোমাকে খুব ভালবাসব, বেবা, আগের চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তুমি আমাকে মাঝে মাঝে ব'লো, আমাকে দিয়ে তোমার প্রয়োজন আছে, আমাকে তুমি সত্যি সত্যি চাও, গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা কর!

—কি যে পাগলের মত যা' তা' তুমি বলছ!..রেবা নিজের ঠোঁট-দুইটি আবার সুবিনয়ের মুখের দিকে আগাইয়া ধরিল।

সত্যই বোধ হয় সুবিনয় খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।

উন্মত্ত আগ্রহে, প্রচণ্ড আবেগে সে রেবাকে নিজের বুকের সঙ্গে নিষ্পেষণ করিল, তাহার ঠোঁটে, কপালে, চিবুকে, চূর্ণকুন্তলে চুম্বন বর্ষণ করিতে লাগিল, অনেক দিন পর আজ আবার সে মধুযামিনীর আকুলতা নিয়া রেবাকে গ্রহণ করিল।

এদিকে তপতী উন্মুখ আগ্রহে সুবিনয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সুবিনয়ের কাছে অবশেষে ধরা দিয়া তাহার মনে এতটুকু অনুশোচনার ঢেউ ওঠে নাই, বরং সে অননুভূতপূর্ব একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিল। সে একমাত্র সুবিনয়কেই ভালবাসিয়াছে, তাহাকে পরিতৃপ্তি দিয়া তাহার নারীত্ব সার্থক হইয়াছে, ইহার মধ্যে লজ্জা বা অপমানের কোন কথাই উঠিতে পারে না! শুধু তাহার মনে কৌতূহল হইতেছিল, সুবিনয় কি ভাবিতেছে? তাহার এই আত্মসমর্পণে সুবিনয় নিশ্চয়ই তাহাকে সুলভ সাধারণ মনে করিতেছে না!

সুবিনয় আসিল না। তপতীর মনটা কেমন যেন বিপর্যস্ত হইয়া গেল। সুবিনয় আসিলে তাহাকে কি কথা বলিবে, কিভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, এই সমস্ত জল্পনা-কল্পনাই ব্যর্থ হইল! অভিমানাহত তপতী অনেকক্ষণ বসিয়া নীরবে কাঁদিল।

সুবিনয় আসিল পরের দিন, ঠিক সেই পাঁচটার ট্রেণে। আবার সেই লজ্জাবনত মুখ করিয়া বলিল, কাজের ভীড়ে কাল আসতে পারিনি', তপতী!

তপতী কোন কথা বলিল না।

সুবিনয় বলিয়া চলিল, স্টেশন মাস্টারবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্তটাও করা হয়নি,' তাই টেলিফোন করতে সাহস হ'ল না। কি জানি কি ভাব্‌বেন!

তপতী তবু নীরব।

—তুমি খুব রাগ করেছ, না?...সুবিনয় প্রশ্ন করিল।

এবার তপতী জবাব দিল। অত্যন্ত উদাস ভাবে বলিল, না...

—নিশ্চয় তুমি রাগ করেছ!..লক্ষ্মীটি, কাছে এসো।...বলিয়া সুবিনয় তপতীকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল।

তপতী বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না, কিন্তু বাধাও দিল না। শুধু বলিল, সত্যি কি কাজের ভীড় ছিল, না অন্য কিছু?

অতর্কিত এই আঘাতে সুবিনয় চমকাইয়া উঠিল। একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, না, হ্যাঁ, কাজও ছিল, তাছাড়া রেবা বড্ড গোলমাল করছিল!

—পরশু রাতটা বাইরে ছিলে ব'লে বুঝি?

একটা ঢোঁক গিলিয়া সুবিনয় বলিল, হ্যাঁ...

—আমাকে ব'লে গেলেই পারতে। তাহ'লে আমি তোমার জন্য এমন উন্মুখ হ'য়ে বসে থাকতাম না। বলিতে বলিতে তপতীর চোখ ছল্ ছল করিয়া আসিল, কিন্তু প্রচণ্ড প্রয়াসে সে অশ্রুরোধ করিল।

অপরাধীর মত মুখ করিয়া সুবিনয় বসিয়া রহিল।

তপতী মুখে হাসি টানিয়া বলিল, যাক্‌গে তোমাকেই বা দোষ দেই কি ক'রে, যে দোটানার মধ্যে পড়েছ!. আজ তোমার কি প্রোগ্র্যাম?

—তুমি যা ব'লো!

—আমি কি বলব, সুবিনয়?. রেবার কাছে কি প্রতিশ্রুতি তুমি ক'রে এসেছ সে ত আমার জানা নেই!. আমি শুধু জানতে চাচ্ছি তুমি কি এখানে খাবে, না বাড়িতে ফিরে গিয়ে খাবে?

—এখানেই খাব এবং থাকবও! বেশ জোর গলায় সুবিনয় বলিয়া বসিল।

-ভেবে দেখো, বাড়িতে আবার অশান্তির সৃষ্টি যেন না হয়! তাহার শেষের কথাটির মধ্যে একটু ঈর্ষাও বোধ হয় ফুটিয়া উঠিল।

—ভেবেই বলেছি, তপতী!

সুবিনয় একপ্রকার জোর করিয়াই থাকিয়া গেল সত্য, কিন্তু আজ রাত্রিতে তাহাদের ভালবাসা ঠিক আগের মত ফুটিয়া উঠিল না। অনেকক্ষণ

পর্যন্ত তপতী নিজেকে সংকুচিত, দুর্লভ করিয়া রাখিল এবং সুবিনয়ও তপতীর আড়ষ্টতা ঘুচাইতে বিশেষ প্রয়াস করিল না।

পরের দিন ভোরের ট্রেণে চলিয়া যাইবার সময় সুবিনয় তপতীকে জানাইয়া গেল যে সে হয়ত দিন দুই তিন আসিবে না। তপতী কোন অনুরোধ জানাইল না বা প্রতিবাদ করিল না।

সুবিনয় আসিবে না, সারাটা দুপুর এবং বৈকাল নির্জন গৃহে একা বসিয়া থাকার সম্ভাবনা তপতীর কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাই দ্বিপ্রহরের খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে ট্রেণে চলিয়া গেল কলিকাতায়-- খানিকটা বৈচিত্র্যের জন্য। তাহা ছাড়া আবশ্যকীয় কয়েকটা জিনিস কিনিবারও প্রয়োজন ছিল, সে স্থির করিল এই সুযোগে এই কাজও সারিয়া নিবে।

নিউ মার্কেটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁটিনাটি অনেক জিনিস সে কিনিল। প্রকাণ্ড একটা পার্শেল নিয়া সে ট্যাক্সির খোঁজে বাহিরে আসিবে এমন সময় তাহার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইল অসীম।

—একি তপতী, তুমি এখানে, কল্‌কাতায়?...বিস্ময়াকুলকণ্ঠে অসীম প্রশ্ন করিল।

- না, ডাঃ রায় কল্‌কাতায় এসেছিলাম কতকগুলো জিনিস কিনতে। এখন ফিরে যাচ্ছি।

—তারপর, কেমন আছ? আজকাল একটু সুস্থ বোধ করছ ত?

—ভালই আছি, ডাঃ রায়। আপনি ত খোঁজই নেন্ না, মরে গেছি না বেঁচে আছি।.. অভিমানাহতস্বরে তপতী বলিল।

—প্র্যাক্‌টিস্‌টা জমেছে কি না তপতী, তাই সময় পাই না!...তা' সুবিনয় যাওয়া-আসা করে না?

সুবিনয়ের উল্লেখে তপতীর মুখ হঠাৎ লজ্জারুণ হইয়া উঠিল। বলিল, হ্যাঁ, যান্ বই কি! এই ত আজও গিয়েছিলেন।

—আজ? সে কি? তার কলেজ নেই?...বিস্মিতসুরে অসীম প্রশ্ন করিল।

—খানিকক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন, আমার ওখান থেকেই কলেজে চলে গেলেন। আচ্ছা, এখন তাহ'লে আসি, আসবেন একবার সময় ক'রে, অনেক গল্পগুজব করা যাবে!

বলিয়া অসীমকে আর কোন প্রশ্ন করিবার অবসর না দিয়াই তপতী দ্রুতগতিতে একটা ট্যাক্সিতে যাইয়া উঠিল। অসীম খানিকক্ষণ হতভম্বের মত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

পাঁচটার ট্রেণে গৃহে ফিরিয়া তপতী সবচেয়ে অবাক্ হইল দেখিয়া যে সুবিনয় বসিয়া রহিয়াছে—তাহারই প্রতীক্ষায়।

—তুমি? তুমি না বলেছিলে দু'তিন দিন আসবে না?

—প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না, তপতী।

—বেশ ত!. হাসিয়া তপতী বলিল। তাহার অন্তরে যে ক্ষুব্ধতা এবং অভিমান স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল তাহা এক নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বলিল, কখন এলে?

—চারটার গাড়িতে। এখান থেকে সোজা কলেজে গিয়েছি এবং সেখান থেকে আবার সোজা এখানে চলে এসেছি!

—এ ভারী অন্যায় করেছ। তোমার স্ত্রী ভয়ানক ভাববে কিন্তু। অন্ততঃ একটা খবর দিয়ে আসা উচিত ছিল।

—সে ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। বলেছি আমার এক বন্ধু আমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, সপ্তাহান্তটা তার সঙ্গে কাটাতে। কাল রবিবার, একেবারে সোমবার দিন ফিরে যাব!

তপতী খুসী হইল, যদিও তাহার মনে খোঁচা লাগিযা রহিল যে রেবার সঙ্গে সুবিনয় একটু বেশিরকমের প্রতারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সুবিনয় বলিল, বড্ড খিদে পেয়েছে, তপতী! সারাদিন শুধু দু' পেয়ালা চা' ছাড়া কিছুই খাওয়া হয়নি'!

অপ্রস্তুত হইয়া তপতী বলিল, ছিঃ, একথা আগে বলতে হয়! আর তুমিই বা কেমন অদ্ভুত লোক গো, চাকরবাকরদের ত বলতে পারতে তোমার জন্য কিছু খাবার তৈরী ক'রে দিতে!...নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

বলিতে বলিতে তপতী ছুটিল সুবিনয়ের জন্য চা, টোস্ট, সিঙারা তৈয়ার করিতে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বেশ একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুবিনয় বলিল, আঃ, বাঁচা গেল!

—তবু ত আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাও!...ভ্রূভঙ্গী করিয়া তপতী বলিল।

—দূরে চলে যেতে চাই, কি সখ ক'রে তপতী? চলে যেতে চাই নিতান্ত প্রাণের দায়ে! দোটানার আকর্ষণে যে হাঁপিয়ে উঠি!

—এরই মধ্যে?...শঙ্কাকুলচোখে তপতী প্রশ্ন করিল।

--ভয় পেয়ো না, তপতী, তোমার সঙ্গ আমাকে ক্লান্ত করে না এতটুকুও। তবে বুঝতেই ত পার, রেবার প্রতি কর্তব্য বোধটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারিনি', সঙ্কোচ এসে আমাকে অভিভূত করে যখনই আমি তার সামনে গিয়ে হাজির হই...

—তোমার কর্তব্যবোধে আমি কখনই বিঘ্ন হ'তে চাই না, সুবিনয়।

—সে আমি জানি, তপতী। এবং জানি বলেই ত আমার এই দ্বিধা, এই সংশয়।...তপতী, আমি কর্তব্য-অকর্তব্য, ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার মত স্থৈর্য হারিয়ে ফেলতে বসেছি, আমি আর ভাবতে পারছি না, তুমি অন্তত্তঃ আমাকে প্রশ্ন ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলো না। তুমি শুধু আমাকে ভালবেসো, আর আমার ভালবাসা গ্রহণ ক'রে আমাকে বুঝতে দিয়ো তুমি আমাকে ঘৃণা কর না!

বলিতে বলিতে সুবিনয়ের মুখ আকুলতায় কাতর হইয়া উঠিল। তাহাকে আশ্বস্ত করিবার প্রয়াসে তপতী নিজেকে সুবিনয়ের আলিঙ্গনে সমর্পণ করিয়া দিল।

একটু শান্ত হইয়া সুবিনয় বলিল, আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারি না যে সম্পূর্ণভাবে তোমাকে পেয়েছি। কয়েকদিন আগেও তুমি ছিলে আমার কাছে অত্যন্ত দুর্লভ—তাই বুঝি এই অবিশ্বাস! অথচ, তোমার প্রত্যেকটি ব্যবহারে, গতিভঙ্গীতে আমাকে তুমি বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছ যে তুমি একান্তই আমার!...সত্যি কি তুমি চিরকাল আমারই থাকবে, তপতী?

অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তপতী জবাব দিল, নিশ্চয়ই! তুমি আমাকে কি মনে করো, সুবিনয়? যে আমি এতদিন অত্যন্ত জোর ক'রে, নিজের মন এবং যৌবনের উপর তীব্র কশাঘাত ক'রে, নিজেকে প্রতিহত ক'রে রেখেছিলাম তোমার আকুল আহ্বানের কাছ থেকে. সেই আমি যে মুহূর্তে ধরা দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকে হয়েছে আমার নবজন্ম। আমার এই নতুন জীবনই এখন আমার কাছে সব চেয়ে বড় সত্য—একে কি আমি উপেক্ষা করতে পারি কখনও?

সুবিনয় আর কোন প্রশ্ন করিল না। স্নিগ্ধ শান্তিতে সে তপতীর মুখখানা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল।

সত্যসত্যই সুবিনয় সমস্ত সপ্তাহান্তটা তপতীর সাহচর্যে কাটাইল। তপতী লক্ষ্য করিল শনিবার দিন সুবিনয় যে চঞ্চলতা নিয়া তাহার কাছে আসিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়া গেল তাহার সঙ্গে দুই দিন দুই রাত্রি কাটাইবার ফলে। সোমবার স্টেশনে যাইবার অব্যবহিতপূর্বে সে তপতীর দুইটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়া শুধু বলিল, আমার আর কোনই দুঃখ নেই তপতী, একমাত্র দুঃখ এই যে তোমাকে জোব ক'রে গ্রহণ করবার মত সাহস কয়েকমাস আগে কেন আমার হ'ল না!

হাসিমুখে তপতী জবাব দিল, আমার দিক থেকে কোনই দুঃখ নেই, সুবিনয়!

এইভাবে আরম্ভ হইল সুবিনয়ের দ্বৈত জীবন। একদিকে রেবা, অপর দিকে তপতী, দুইজনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া রহিল তাহার প্রত্যেকটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি অবসর। কিন্তু জীবনের গ্রন্থিতে এই যে নূতন জট পাকিতে আরম্ভ করিল তাহা সহজ বা সবল করিয়া তুলিবার কোনই প্রয়াস সে করিল না। রেবা হইয়া রহিল তাহার গতানুগতিক

জীবনের সহযাত্রিনী, আর তপতী তাহাকে দিতে লাগিল স্বপ্নময় মদিরার আস্বাদ।

স্বামীর পরিবর্তন যে রেবা লক্ষ্য করে নাই এমন নয়।

তপতীর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি না হইলেও সে কয়েক দিনের মধ্যেই লক্ষ্য করিল স্বামী সবসময় কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, এবং কয়েক ঘণ্টা বা একটা দিনের ব্যবধানের পর—বন্ধুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াই—তাঁহার সেই অন্যমনস্কতা ও ঔদাসীন্য অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া যায়।

স্বামীকে সে প্রশ্ন করিল, কে এই বন্ধু যাহার সাহচর্য আজকাল তাহার কাছে স্ত্রীর সাহচর্যের চেয়েও বেশি আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। সুবিনয় প্রশ্ন এড়াইতে চেষ্টা করিল না, এমন একটা জবাব দিল যে রেবা তাহা স্বামীর সম্মুখে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহার অবচেতন মন তৃপ্ত হইল না—কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, কোথায় যেন একটা গলদ রহিয়া গেল!

অথচ রেবার এমন কোন আত্মীয় বা বন্ধু ছিল না যাহাকে সে স্বামীর এই বন্ধু সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সুবিনয় প্রথম হইতেই এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল যে অসীম কখনও তাহার বাড়িতে পদার্পণ করিতে এবং রেবার সঙ্গে পরিচিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। এবং একমাত্র অসীমই হয়ত রেবাকে সত্যের সঙ্গে খানিকটা পরিচিত করিয়া দিতে পারিত।

তাহা ছাড়া, রেবার স্বাভাবিক লজ্জা ও সুবিনয়ের আত্মগোপনকে অনেকখানি সাহায্য করিল। স্বামীর উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করিবে, যে স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে সাংসারিক প্রতিকূলতার ঝাপটা হইতে রক্ষা করিয়াছে তাহার পশ্চাতে সে গোয়েন্দাগিরি করিবে, এই চিন্তাও তাহার কাছে অত্যন্ত নীচ মনের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইল। ভালবাসিয়া তাহার বিবাহ হয় নাই, অন্ততঃ সুবিনয়ের দিক দিয়া তাহার প্রতি ভালবাসার সঞ্চার যে হয় নাই, ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই সে নীরবে সহ্য করিতে লাগিল সুবিনয়ের সামঞ্জস্যহীন ব্যবহার, তাহার অতর্কিত অনুরাগ-বিরাগের তরঙ্গ। কেবল কায়মনোবাক্যে সে প্রার্থনা করিতে লাগিল

ভগবানের কাছে, তাহার কোলে যেন একটি সন্তান আসে,—সন্তানের পিতা সুবিনয় নিশ্চয়ই সন্তানের জননী রেবাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না!

ওদিকে তপতীও ভাবিতে সুরু করিয়াছিল। নিঃসহ যৌবনের তাড়নায় সুবিনয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া তপতী অনুতপ্ত বোধ করে নাই এতটুকু, বরং সে খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিল এই ভাবিয়া যে সুবিনয়ের অসন্তুষ্ট জীবনে সে আনিয়া দিতে পারিয়াছে শান্তি এবং তৃপ্তি। কিন্তু তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল রেবার কাছে সম্পূর্ণ-ভাবে গোপন করিয়া রাখিতে সুবিনয়ের আকুল প্রয়াস। সমাজের আইন-কানুন অনুসারে সুবিনয়ের সঙ্গে তাহার বর্তমান সম্পর্ক অশুচিকর এবং অশোভন হইলেও, নিজের দিক দিয়া তপতীর কোনই অশুচিবোধ ছিল না। প্রথম হইতে সুবিনয় তাহাকেই ভালবাসিয়াছে এবং সেও ভালবাসিযাই সুবিনয়ের কাছে নিজেকে ধরা দিয়াছে, ইহার মধ্যে সমাজের কোন কথা বলিবার আছে তাহা সে স্বীকার করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তপতী বিচরণ করিতেছিল একটা রসের রাজ্যে, যেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের চিরন্তন খেলা চলে। তাহার চারিদিকের আকাশ-বাতাস, অবকাশ প্রকাশ পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছিল যৌবনের স্বপ্নময় সুরে। তাই সে কঠিন ধাক্কা খাইল যখন সুবিনয়ের ভাবভঙ্গীতে এবং ব্যবহারে সে দেখিতে পাইল সুবিনয় ঠিক তাহার স্বপ্নময় দৃষ্টি দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ছোটখাট ঘটনায়, টুক্‌রা টুক্‌রা কথায় সুবিনয়ের চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া তপতী মাঝে মাঝে কেমন যেন অন্য-মনস্ক হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

একদিন সে সোজাসুজি অনুরোধ জানাইল, রেবার কাছে আমার কথা তোমাকে বলতেই হবে, সুবিনয়। এরকম গোপনতার প্রয়াস আমার কাছে অত্যন্ত অসহনীয় মনে হচ্ছে।

সুবিনয় জবাব দিল, বলতে আমার কোনই আপত্তি নেই, তপতী, কিন্তু ব'লে কোন লাভ হবে কি? মাঝখান থেকে শুধু অশান্তির সৃষ্টি

হবে—কারণ রেবা কিছুতেই আমাদের এই ভালবাসাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে না!

—বিষয়টাকে তুমিই ত দিন দিন আরও জটিল, আরও ঘোরালো ক'রে তুলছ, সুবিনয়।...প্রথম থেকেই তুমি যদি রেবার কাছে সব কথা খুলে বলতে তাহ'লে আমি নিশ্চয় জানি সে অনেকখানি কম ক্ষুব্ধ হ'ত! এখন তোমার, আমাকে ভালবাসার চেয়েও তার বুকে বাজবে তোমার এই গোপনতার প্রয়াস, যা' প্রতারণার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

আহতভাবে সুবিনয় জবাব দিল, তুমি রেবাকে জান না, তপতী। সে আমাকে দাবী করে সম্পূর্ণভাবে, কোন অংশীদার সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, পারবে না!

—কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে? দিন যত যাবে পরিস্থিতি কি আরও বেশি কঠিন, আরও দুঃসহ হয়ে উঠবে না? একদিন না একদিন যে তোমাকে আত্মপ্রকাশ করতেই হবে, সুবিনয়!

সেদিনকার মত সুবিনয় তপতীর প্রশ্ন এড়াইয়া গেল এই প্রতিশ্রুতি দিয়া যে আর কিছুদিন পরে সময় এবং সুযোগ বুঝিয়া সে নিজেই রেবাকে সব কথা খুলিয়া বলিবে। ততদিন তপতী যেন ধীরভাবে অপেক্ষা করে।

তপতী আর কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার মনের একটা তার কেমন যেন বেসুর হইয়া গেল। বিচিত্র এই সমস্যার জালে জড়াইয়া পড়িয়াও সে তাহার স্বপ্নের বিহ্বলতাকে জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সুবিনয় ঠিক পথে চলিতেছে না।

বৈচিত্র্যহীন আলস্যে আরও দুইটা মাস কাটিয়া গেল।

এই দুইটা মাসের মধ্যে সুবিনয় অনেকবার তপতীর কাছে আনাগোনা করিল। যতক্ষণ সুবিনয় কাছে থাকিত তপতী তাহার মনের দ্বন্দ্ব এবং অস্বস্তি অনেক পরিমাণে ভুলিয়া যাইত, কিন্তু সুবিনয় চলিয়া গেলেই সে নানাপ্রকার ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করিত। যৌবনের যে আকুলতায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে সুবিনয়কে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল তাহার রেশ একেবারে

মিলাইয়া না গেলেও সে এই দুই মাসের মধ্যে অনেকখানি আত্মস্থ ও সুস্থির হইতে পারিয়াছিল এবং বুদ্ধির আলোকসম্পাত করিয়া তাহার এবং সুবিনয়ের সম্বন্ধের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছিল। একদিকে তাহার মনে হইতেছিল সমাজের ভ্রূকুটির কথা। সমাজের প্রত্যেকটি শাসন-অনুশাসনের প্রতি তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা না থাকিলেও সে এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল যে সুবিনয়ের সঙ্গে তাহার প্রেমজীবন বর্তমান ব্যবস্থায় বেশি দিন চলিবে না। চাকরদের কানাঘুষা নিয়া সে বেশি মাথা না ঘামাইলেও নিজের মনের কাছে সে এটা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে সুবিনয় যদি শীঘ্রই তাহাকে সম্ভ্রমজনক একটা স্থান না দেয তবে তাহাব সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। বিচ্ছেদের সম্ভাবনার কথা ভাবিতেও তাহার বুকটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল, কিন্তু অন্য কোন পথও সে খুঁজিয়া পাইল না। দ্বিতীয়তঃ, তাহার সব চেয়ে খারাপ লাগিল সুবিনয়ের ভীরু ব্যবহার। অনির্দিষ্টকালের জন্য সুবিনয় তাহার কথা রেবার নিকট হইতে সম্পূর্ণভাবে গোপন করিয়া যাইতেছে—ইহার সন্তোষজনক একটা কারণও সে দেখিতে পাইল না।

তাহার মনের এই দ্বিধার প্রকাশ পাইল তাহাব ব্যবহারে। সুবিনয লক্ষ্য করিল তপতী যেন ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতেছে। একটি মাস পূর্বেও যে আকুল আগ্রহে তপতী নিজেকে তাহাব কাছে সমর্পণ করিয়া দিত তাহার তীব্রতা যেন অনেকখানি কমিয়া যাইতেছে—তাহার আলিঙ্গনে আদরে যেন সেই প্রথম কয়েক দিনের উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠিতেছে না। অনেকটা যেন গতানুগতিকভাবে তপতী নিজেকে তুলিয়া ধরিতেছে তাহার সম্মুখে।

সুবিনয় বিরক্ত হইল। তপতীর নিজেকে রোধ করিয়া রাখিবার এই প্রয়াস তাহার কাছে অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল। একদিন সে মুখ ফুটিয়া বলিয়াই ফেলিল, তুমি যেন কেমন বদ্‌লে যাচ্ছ, তপতী!

—কৈ, না!...ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া তপতী জবাব দিল।

—আমি প্রত্যেক মুহূর্তে বুঝতে পারছি, তপতী, তুমি অস্বীকার করলে চলবে না!

তপতী কোন কথা বলিল না। কি বলিবে সে?

সুবিনয় বলিল, তুমি আমার কাছে ধরা দিয়েছ সত্য, কিন্তু তোমার মনের আশেপাশেও আমি পেঁছুতে পারলাম না, তপতী! কেন, কি অপরাধ করেছি আমি?

—অপরাধের কোন কথাই ত আমি বলিনি'!

—জানি। কিন্তু কেন তুমি জোর ক'রে আমার ভালবাসা কেড়ে নেবার চেষ্টা কর না, তপতী? কেন তুমি একটি দিনও আমাকে প্রশ্ন কর না, আমি তোমাকে ভালবাসি কি না!...আমার স্ত্রী রেবার সম্পর্কে তোমার ঈর্ষা এবং কৌতূহলের অভাবও আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ব'লে মনে হয়।

—আমি লোকটা স্বভাবতঃই একটু কম কৌতূহলী, একটু কম ঈর্ষা-পরায়ণ, সুবিনয়!..একটু হাসিয়া তপতী জবাব দিল।

—তার মানে এই যে তুমি আমাকে যথার্থভাবে ভালবাস না!...ক্ষুব্ধ-ভাবে সুবিনয় বলিল।

—তুমি ভুল বুঝেছ, সুবিনয়। ভালবাসার শক্তি সকলের সমান থাকে না, তা'ছাড়া পুরুষের ভালবাসা কেড়ে নিতে হ'লে নারীকে পেতে হয় একটা অধিকার, যার দাবীতে সে অনেকখানি প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করতে পারে। তোমার মুখের কথা, যে তুমি আমাকে ভালবাসো, এছাড়া আমার আর কি অধিকার আছে তোমার উপর? কোন্ দুঃসাহসে আমি তোমাকে জোর ক'রে দাবী করব সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে?

—অর্থাৎ তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না যে আমি প্রথমে তোমাকে গ্রহণ না ক'রে রেবাকে গ্রহণ করেছি!

—না, তুমি ঠিক বুঝতে পারলে না, সুবিনয়। রেবাকে তুমি বিয়ে করেছ সেটা জেনেশুনেও আমি তোমার কাছে ধরা দিয়েছি। কাজেই তুমি ঐ অভিযোগটা আমার বিরুদ্ধে এনো না।...আমি শুধু ভাবছি, আমাদের দু'জনের জীবন এর পর কিভাবে চলবে, আর ভাবছি, কেন তুমি আজও আমাদের কথা রেবাকে বলছ না!

বিরক্তভাবে সুবিনয় জবাব দিল, ঐ একটা কথাই কেবল তোমার মনের সব কয়টি কুঠুরিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তপতী!...সমাজে আমার একটা প্রতিষ্ঠা

আছে, সেটা মুহূর্তের খেয়ালে ভেঙ্গে দেওয়া যে সম্ভব নয় সেটা কি তুমি কিছুতেই বুঝতে পারছ না?

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সুবিনয় বুঝিল সে প্রকাণ্ড একটা বোকামি করিয়া বসিল, কারণ তপতীর মুখখানা হঠাৎ কেমন কঠিন হইয়া উঠিল।... তাহাকে শান্ত করিবার প্রয়াসে সে বলিল, যেটুকু সময় কাটাতে চাই তোমার সঙ্গে নিবিড় সাহচর্যে, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে, তা'ও নষ্ট হয়ে যায় অহেতুক তর্কে, আলোচনায়। এ কি ছেলেমানুষি আমরা করছি, তপতী!...এসো, আমাকে আদর করো।

তপতী নিজেকে সমর্পণ করিতে কোনই আগ্রহ প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সুবিনয় উঠিয়া তপতীকে আকর্ষণ করিয়া তাহার ওষ্ঠে চুম্বন মুদ্রিত করিয়া বলিল, ছিঃ, রাগ করতে নেই, এসো, অন্য কথা ব'লো...

সুবিনয়ের স্পর্শের মোহিনীশক্তি তপতী এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। অনিচ্ছার সহিত সে সুবিনয়ের আদরের প্রতিদান দিল, কিন্তু তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই জীবন আর বেশি দিন চলিবে না, ভাঙন ধরিতে সুরু হইয়াছে, অতর্কিত একটা ঝাপটা আসিলেই তাসের দেশ ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে।

*

* *

এই ঝাপটা আসিল কয়েকদিনের মধ্যেই, যেদিন নিঃসংশয়ে তপতী বুঝিল যে সে সন্তানসম্ভবা।

সুবিনয়ের প্রতি তাহার ভালবাসা মুহূর্তের মধ্যে নূতন রূপ পরিগ্রহণ করিল। এতদিন সে চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া, কিন্তু আজ ভ্রূণস্থ সন্তানের চিন্তা তাহাকে একেবারে বিপর্যস্ত করিয়া দিল।

সমাজের ভ্রূকুটি শেষপর্যন্ত সে নিজে হয়ত উপেক্ষা করিতে পারিত,

কিন্তু সন্তানের পরিচয় দিবে সে কি ভাবে? আর অবিবাহিতা জননীই বা দাঁড়াইবে কোথায়? তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সুবিনয় ভবিষ্যতের এই পরিস্থিতি জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে এই বিপদের সম্মুখে টানিয়া আনিয়াছে, ইহার পেছনে আছে শুধু লুব্ধতা, যৌবনের আকুলতা, ভালবাসা নাই এতটুকুও। সুবিনয়ের চরিত্রের মধ্যে যে কাপুরুষতা লুক্কায়িত ছিল তাহা এতদিন তপতী উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু আজ সে দেখিতে পাইল এই কাপুরুষতার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে অত্যন্ত অসহনীয় একটা ক্ষুদ্রতা, অবিশ্বাস্য একটা প্রতারণা। যে স্বপ্নময় মদির রাজ্যে তপতী এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, যাহার বাতাস সেদিনও সে আনন্দে উপভোগ করিতেছিল, পলকের মধ্যে তাহা যেন বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

তপতী স্থির করিল সুবিনয়ের সঙ্গে কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলিতে হইবে। সন্তানসম্ভবা তপতী সন্তানের দাবী নিয়া আসিয়া দাঁড়াইল সুবিনয়ের কাছে।

সংবাদটা শুনিয়া সুবিনয়ের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল।

তপতী বলিল, এবার তোমাকে পথ বেছে নিতেই হবে, সুবিনয়। দু' নৌকায় পা' দিয়ে শান্ত নির্ভরে চলা আর কিছুতেই চলতে পারে না!

তুমি আমাকে কি করতে বলছ, তপতী? ক্ষীণকণ্ঠে সুবিনয় প্রশ্ন করিল।

—তোমার সন্তান যাতে তোমার পরিচয় পায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে, অর্থাৎ রেবাকে সব কথা খুলে বলতে হবে, এবং...

বাকী কথাটা তপতী বলিতে পারিল না, তাহার জিহ্বা কেমন যেন জড়াইয়া গেল। এই অতি সাধারণ কথাটাও সুবিনয়কে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে হইবে? ছিঃ!

সুবিনয় কথা বলিল, অত্যন্ত ধীরে এবং লজ্জাবনতমুখে।

বলতে আমার কোনই আপত্তি ছিল না তপতী, কিন্তু রেবাকে এখন একথা বলা যে অসম্ভব!

—কেন?...বিস্মিতভাবে তপতী প্রশ্ন করিল।

—কারণ, সেও যে আমার সন্তানের মা হ'তে চলেছে! তার শরীরের এই অবস্থায় কেমন ক'রে এই কথাটা তাকে জানাব?

মুহূর্তের জন্য তপতীর মনে হইল সুবিনয় বোধ হয় উপহাস করিতেছে। পরক্ষণেই মনে হইল, না, উপহাস নয়, হয়ত ইহাও অভিনব এক প্রতারণা!...কাপুরুষ সুবিনয়ের পক্ষে সবই সম্ভবপর!

কঠিনভাবে তপতী বলিল, তোমার কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!

—আমার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না হয় অসীমকে জিজ্ঞাসা ক'রো। কালই অসীম রেবাকে দেখতে গিয়েছিল—তার কথা আশা করি তুমি অবিশ্বাস করবে না।

তপতী আর সহ্য করিতে পারিল না। শুধু বলিল, জীবনে এত বড় ভুল বোধ হয় করিনি, সুবিনয়, যে ভুল করেছি তোমাকে ভালবেসে! আমি ত তোমাকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে চেষ্টা করছিলাম আমার জীবন থেকে, কেন তুমি আবার এসে দাঁড়ালে আমার পথে, কুগ্রহের মত?

বলিতে বলিতে তপতী কাঁদিয়া ফেলিল।

স্থানুর মত সুবিনয় বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে তপতী বলিল, তুমি এখ্খুনি এখান থেকে চলে যাও, সুবিনয়। আমাকে একটুখানি ভাবতে সুযোগ দাও।

আর কোন কথা না বলিয়া সুবিনয় সেদিন চলিয়া গেল।

সুবিনয় চলিয়া যাইবার পরই তপতীর মনে হইল অসীমের কথা। সুবিনয় আসিবারও আগে তাহার বিপদের মুহূর্তে অসীমই তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ অসীম কলিকাতার উপকণ্ঠে এই শান্তিবিরল বাড়িতে তাহাকে অধিষ্ঠিত করিয়া সেই যে ডুব মারিয়াছে তাহার পর তাহার কোন খোঁজ নেওয়াও প্রয়োজনীয় মনে করে নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল, একমাত্র অসীমই তাহাকে আবার সাহায্য করিতে পারে। যদি সে অসীমের সম্মুখে যাইয়া দাঁড়ায়, সে নিশ্চয়ই এখন একটা পন্থা বাহির করিয়া দিবে যাহাতে তাহার সমস্ত সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইবে।

পরের দিন সে আবার ছুটিল কলিকাতায়।

*

* *

সুদীর্ঘ দুই মাস পরে তপতীর আকস্মিক আবির্ভাবে অসীম অত্যন্ত বিস্মিত হইল। বলিল, তুমি পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা ক'রো, তপতী, আমি এই কয়টি অভ্যাগতকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে এখ্খুনি আসছি।

তপতী অসীমের বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টারও পরে চেম্বার একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া অসীম আসিল। বলিল, তারপর? কি খবর?

—আপনি সেদিন বল্লেন আমার ওখানে যাবেন, তারপর আর গেলেন না ত, ডাঃ রায়!

—আমি বলেছিলাম নাকি? কাজের ভিড়ে মনে ছিল না, তপতী। ক্ষমাভিক্ষা করছি।

ঈষৎ হাসিয়া তপতী বলিল, আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ রাগ ক'রে থাকা একেবারে অসম্ভব, ডাঃ রায়।...সে যাক্—আমি এসেছি প্রধানতঃ নিজের প্রয়োজনে, যে কথাটা বলব শুনে চম্কে উঠবেন না যেন!

—না, ব'লো।.. অসীম জিজ্ঞাসুনেত্রে তপতীর দিকে তাকাইল।

কথাটা বলিতে যাইয়া তপতী রীতিমত ঘামিয়া উঠিল। অবশেষে মরিয়া হইয়া সে বলিয়া ফেলিল, আমি সন্তানসম্ভবা, সুবিনয় সন্তানের পিতা।

মুহূর্তের মধ্যে অসীমের মুখ কঠিন হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তা' আমার কাছে এসেছ কেন? আমি ডাক্তার, তোমাকে সাহায্য করতে পারি, সেই জন্যে বুঝি?

অপমানে তপতীর কাণ দুইটা রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে সে জবাব দিল, না ডাঃ রায় আপনি ডাক্তার, সেজন্য আমি আসিনি'। আমি এসেছি আপনি একদিন আমাকে বন্ধুত্বের অধিকার দিয়েছিলেন ব'লে। আরও এসেছি আপনি সুবিনয়ের বন্ধু ব'লে।

—ঠিক বুঝতে পারছি না, তপতী। তুমি আমার কাছে কি চাও সোজাসুজি খুলে বললেই খুসী হ'তাম।

অসীমের কথার মধ্যে নির্লিপ্ত রূঢ়তা বাজিয়া উঠিল।

—আমাকে একটু সময় দিন, সব খুলে বলছি।

সংক্ষেপে সমস্ত কথা তপতী খুলিয়া বলিল। সে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিল সুবিনয়ের সহিত তাহার দ্বন্দ্বের কথা, এবং সব শেষে সে জানাইল সুবিনয়ের সঙ্গে আগের দিনের কথোপকথনের ইতিবৃত্ত।

অসীম নীরবে সব শুনিল। তপতীর কাহিনী শেষ হইলে সে শুধু বলিল, এরকম যে হবে 'তা' আমি আগেই জানতাম।.. তোমাকে এবং সুবিনয়কে আমি সময় থাকতে অনেকবার সাবধান ক'রে দিয়েছিলাম, আমার কথা তোমরা একবারও ভেবে দেখনি'!

—সেজন্যে আমি খুব বেশি অনুতাপ করছি না, ডাঃ রায়। নিজের বুদ্ধিতে, প্রবৃত্তিতে যা' করেছি তার জন্য ফল ভোগ করতে হবে প্রধানতঃ আমাকেই, এও আমি জানি। আমি শুধু চাচ্ছি আপনার উপদেশ—আপনি এখন আমাকে কি করতে বলেন?

বেশ একটু বিরক্তির সহিতই অসীম জবাব দিল, আমি আর কি বলব, তপতী! সত্যি কথা যদি বলতে হয় তাহ'লে বলব, তোমার এবং সুবিনয়ের ভালবাসার এরকম পরিণতির জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না!

অসীমের ভর্ৎসনা তপতী নতমুখে গ্রহণ করিল।

অসীম বলিয়া চলিল, এখন তুমি এসেছ আমার উপদেশের মুখাপেক্ষী হ'য়ে! নিজের শয্যা রচনা করেছ তুমি নিজে, সেখানে থাকতে হবে তোমাকেই, অভিযোগ করা এখন তোমার সাজে না!

মৃদুকণ্ঠে তপতী বলিল, আমি অভিযোগ করছি না, ডাঃ রায়।

অসহিষ্ণুভাবে অসীম জবাব দিল, আমি অত্যন্ত সহজ স্থূলবুদ্ধি লোক, তপতী, কথার সূক্ষ্মতা আমি বুঝতে পারি না! সুবিনয়ের ব্যবহার আমি সমর্থন করছি না মোটেই, কিন্তু ডাক্তার হ'য়ে আমি কিছুতেই এই উপদেশ তাকে দিতে পারব না যে সে তার স্ত্রীর শরীরের বর্তমান অবস্থায় তোমার কথা তাকে বলে!

—কিন্তু আমার দিকটা আপনি একেবারেই ভুলে গেলেন ডাঃ রায়?... আপনি জানেন রেবা যখন সুবিনয়ের জীবনের ছায়াও মাড়ায়নি' তখন থেকে

আমি সুবিনয়কে ভালবাসতাম, সুবিনয়ও আমাকে ভালবাসত। আমি ত সুবিনয়ের জীবনে পশ্চাৎবর্তিনী হয়ে আসিনি—আমি যে ছিলাম অগ্রণী! আমার দাবীটা কি এতই সুলভ, অকিঞ্চিৎকর, ডাঃ রায়?

বলিয়া দৃপ্তভাবে উজ্জ্বল চোখে তপতী অসীমের দিকে তাকাইল।

তপতীর কথাগুলি সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন না করিলেও মনে মনে অসীম এই সাহসিকা বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে প্রশংসা না করিয়া পারিল না। কিন্তু মুখে সে বলিল, ন্যায়, অন্যায এবং দাবী-দাওযার নৈতিক বিচারের কোনদিন শেষ হবে না, তপতী। তুমি আমার উপদেশ চাচ্ছ—আমি বলতে পারি শুধু এই যে তুমি সুবিনয়কে অনুরোধ কবতে পার এখন গোপনে হিন্দুমতে সে যেন তোমাকে বিয়ে করে। রেবার সন্তান জন্মাবার পর, তার শরীরের অবস্থা বুঝে, খবরটা রেবার কাছে ভাঙা যাবে। তবে সুবিনয় যদি রাজী না হয় তাহ'লে তোমার সন্তানের দায়িত্ব একমাত্র তোমাকেই গ্রহণ করতে হবে!

ক্ষুব্ধকণ্ঠে তপতী বলিল, প্রকারান্তরে আপনি বলছেন যে গলায় কাপড় দিয়ে আমাকে উপস্থিত হতে হবে সুবিনয়ের কাছে, কাতর নিবেদন জানিয়ে যে সে যেন সমাজের সম্মুখে আমার সম্মান রাখে! নিজের থেকে একথাটা সুবিনয়ের একবারও মনে হবে না, ডাঃ রায়?

একটু হাসিয়া অসীম বলিল, সুবিনয়কে ত তুমি আমার চেয়ে ভাল ভাবেই জান! সে হচ্ছে স্বভাবতঃই ভীরু—যা' অসাধারণ তা' করবার মত সাহস তার নেই। কাজেই তাকে অনুনয় বা ভয় দেখিয়ে বাধ্য করা ছাড়া অন্য কোন উপায়ই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

—আমি এতখানি ছোট হ'তে পারব না, ডাঃ রায়।.. দৃঢ়কণ্ঠে তপতী জবাব দিল।

—তাহ'লে ত আমার আর কোন উপদেশই দেবার নেই, তপতী!

তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি তোমাকে তোমার ভ্রূণস্থ সন্তান নষ্ট করতে কোনপ্রকার সহায়তা করি?

—না, না, কিছুতেই না, ডাঃ রায়!...জোর গলায়, একপ্রকার আর্তকণ্ঠে তপতী বলিয়া উঠিল।

অসীম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর স্নেহমাখা স্বরে বলিল, এখন তুমি রতনপুরে ফিরে যাও, তপতী।...সুবিনয় হয়ত দু'এক-দিনের মধ্যেই তোমার কাছে যাবে—আমার এখনও মনে হচ্ছে, তুমি যদি তার কাছে তোমার দাবীটা পরিষ্কারভাবে পরিবেশন কর, সে তা' মেনে নিতে বাধ্য হ'বে।.. আর সে যদি কিছুতেই রাজী না হয়, তাহ'লে আমি, তোমার বন্ধু ডাঃ রায়, ত রইলামই! আমি ভেবে দেখব আর কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। তুমি এখন খুব বেশি চিন্তা ক'রো না—কারণ তোমার শরীরও ত ভাল নেই!

অসীমের শেষ কথা কয়টির মধ্যে যথার্থ স্নেহ এবং উদ্বেগ যেন ঝরিয়া পড়িল। তাহার কাছ হইতে বিদায় নিবার সময় তপতী বলিল, সময়ে অসময়ে আপনার উপর যে অসম্ভব অত্যাচার করি সেজন্য কিছু মনে করবেন না, ডাঃ রায়, কারণ আজ আমি দেখছি এই বিশাল পৃথিবীতে আপনি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধুই নেই!

*

* *

রেবা আশা করিয়াছিল তাহার সন্তানসম্ভাবনার সংবাদ শুনিয়া সুবিনয় খুসী হইবে, কিন্তু স্বামীর ভাবভঙ্গীতে কোন প্রকার প্রফুল্লতার লক্ষণই সে দেখিতে পাইল না।

সে আরও বিস্মিত হইল যখন দিন দুই পরে দেখিতে পাইল সুবিনয় যেন অত্যন্ত বেশি চিন্তিত ও অন্যমনস্ক ব্যবহার করিতেছে। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, সুবিনয় কি চায় নাই সে সন্তানের জননী হয়!

অবশেষে সে আর সহ্য করিতে পারিল না, মুখ ফুটিয়া একদিন বলিয়াই ফেলিল, আমাদের প্রথম সন্তান, তোমাকে এতটুকুও খুসী দেখছি না কেন গো?

সুপ্তোত্থিতের মত সুবিনয় জবাব দিল, অ্যাঁ—না, আমি খুসী হইনি' বলিনি' ত!

—খুসী হয়েছ সেকথাও ত বলনি'! তা'ছাড়া তোমার প্রত্যেকটি কথায়, ব্যবহারে ঝরে পড়ছে গভীর ঔদাসীন্য, ঘোরতর বিরক্তি। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তোমাকে অন্যরকম দেখব।

কাতরভাবে সুবিনয় বলিল, নিজের উপর কত বড় দায়িত্ব এসে পড়ল সেই কথাই ভাবছি, রেবা, তা'ছাড়া আর কোনই কারণ নেই আমার এই চিন্তাকুলতার।

জবাবটা রেবার মনঃপূত হইল না। সে স্থির করিল স্বামীব বন্ধু অসীমকে জিজ্ঞাসা করিবে।

ডাঃ রায়ের সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল এই সন্তানসম্ভাবনার ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করিয়া। সুবিনয়ই অসীমকে অবশেষে বাড়িতে ডাকিয়াছিল, রেবাকে একবার পরীক্ষা করিয়া যাইতে - এবং অসীম যথারীতি পরীক্ষা করিযা জানাইয়া দিয়াছিল যে রেবার সন্দেহই সত্য। তাহার পর সে চটুল ভঙ্গীতে সুবিনয়কে অভিনন্দনও করিয়াছিল তাহার আসন্ন পিতৃত্বের জন্য।

রেবার আহ্বানে অসীম আবার সুবিনয়ের বাড়িতে আসিল। বলিল, আবার কি খবর?

নতুন খবর আবার কি হবে ডাঃ রায়? আপনার বন্ধুর সম্বন্ধে কথা বলতে আপনাকে ডেকেছি।

—কেন, তার আবার কি হ'ল?

—শরীবেব কোন অসুখবিসুখ হয়নি', তবে তাঁর মনের গতিবিধি আমাব বুদ্ধির বাইরে চলে গেছে।...আচ্ছা, তাঁর কি হযেছে বলতে পারেন? সব সময়ই কেমন যেন মন-মরা হ'য়ে আছেন!

অসীম ত ভালভাবেই জানে সুবিনয়ের এই অন্যমনস্কতার কারণ। কিন্তু রেবার কাছে ত তাহা বলা চলে না! সে অজ্ঞতার ভাণ করিয়া বলিল, কই, আমি ত কিছু জানি না! কলেজের খাটুনী হঠাৎ বেড়েছে বোধ হয়,

তাই আপনি তাকে এত শুকনো শুকনো দেখছেন। তা'ছাড়া আপনি দেখেন তাকে কল্পনার জালের মধ্য দিয়ে—তাই অনেক সময় অহেতুক আশঙ্কা জাগে আপনার মনে!

অসীমের পরিহাসটা গ্রাহ্য না করিয়া রেবা বলিল, কলেজের খাটুনীই যদি কারণ হ'ত, ডাঃ রায়, তাহ'লে সেকথা ত আমাকে তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন! অথচ আমি যখন প্রশ্ন করলাম, তিনি অদ্ভুত একটা জবাব দিলেন, বল্‌লেন বাপ হ'ব্বার দায়িত্বের কথা ভেবে তিনি হ'য়ে উঠছেন চিন্তাকুল।...সত্যি কি এরকম হয়, ডাঃ রায়?

অসীম দেখিল সুবিনয় যে কারণ নির্দেশ করিয়াছে তাহার সমর্থন করাই হইবে সবচেয়ে সমীচীন। খানিকটা স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি থাকিলেও রেবার যে তপতীর মত অন্তর্দৃষ্টি নাই তাহা অসীম বুঝিয়াছিল।

সে জবাব দিল: তা' অনেক সময় হয় বই কি, রেবা দেবী! আপনি ত জানেনই, সুবিনয় তার বাবা-মার একমাত্র সন্তান, এবং এজন্য তাকে জোর ক'রে অনেক অভিলাষ পরিত্যাগও করতে হয়েছে। এই আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে সন্তানের পিতা হব্বার সম্ভাবনায় সে যদি একটু বিচলিত হ'য়ে থাকে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কোনই কারণ নেই। আপনি এজন্য মোটেই চিন্তিত হবেন না!

অসীমের আশ্বাসে এবং অভয়দানে রেবা অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করিল। বলিল, আপনাকে এই জন্যই ডেকেছিলাম, ডাঃ রায়। আপনি আমার বুকের মস্ত বড় একটা বোঝা হাল্‌কা ক'রে দিলেন!

•

কয়েক সপ্তাহ পরে ব্রজমোহনবাবুও শুনিলেন পৌত্রমুখ সন্দর্শনের সম্ভাবনার কথা। বলা বাহুল্য, তিনি অত্যন্ত খুসী হইলেন। সুবিনয় বিবাহ করিয়া শান্তসুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে ইহা তিনি নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়া থাকিলেও তাঁহার মনে একটা সংশয় সবসময়ই জাগিয়া উঠিত যে বুঝি বা সুবিনয় আবার তাহার পূর্বরাগের আহ্বানে গা' ঢালিয়া দেয়। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে রেবার স্বামী সুবিনয়ের পক্ষে এইপ্রকার চঞ্চলতা যদিচ সম্ভব হইতে পারিত, পুত্রের পিতা সুবিনয়ের

দৃঢ়ভাবে একনিষ্ঠ এবং সাংসারিক জীবনযাত্রায় স্থিতিশীল হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রহিল না। আর তাঁহার অদম্য কৌতূহল জাগিল আসন্ন পিতৃস্বপদাধিকারী পুত্রের হাবভাব গতিভঙ্গীর সঙ্গে চাক্ষুষভাবে পরিচিত হইতে। অবশেষে কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বৃদ্ধ নায়েব বিপ্রদাসবাবুকে সঙ্গে নিয়া তিনি একদিন চলিয়া আসিলেন কলিকাতায়।

*

* *

এদিকে সুবিনয় সত্যসত্যই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন তপতীর গৃহ হইতে একপ্রকার বিতাড়িত হইয়া আসিয়া অবধি সে কোন কাজেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। তাহার উপর রেবার প্রশ্ন, তাহার বুদ্ধিহীনতা তাহার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হইতেছিল। যদিও সে নিজেই নানাপ্রয়াসে তপতীর অধ্যায় রেবার নিকট হইতে একেবারে চাপিয়া গিয়াছিল, তবু তাহার এক একবার মনে হইতেছিল রেবা যদি বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহার অশান্তির যথার্থ কারণটা জানিয়া নিতে পারিত তবে বোধ হয় এক হিসাবে অনেকখানি শান্ত বোধ করিত। দুইদিকের দাবীর কোনই সামঞ্জস্য সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, এবং তাহার ফলে সে মনে মনে রেবা এবং তপতী উভয়েরই প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল।

রাগ করিয়া সে প্রায় সপ্তাহখানেক তপতীর কোনই খোঁজখবর করিল না। ইতিমধ্যে একদিন তাহার দেখা হইল অসীমের সহিত। সুবিনয় অসীমকে এড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অসীমই তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

অসীম বলিল, তোর সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা আছে, সুবিনয়।

সুবিনয় মনে মনে অসীমকে বেশ ভয় করিত। বলিল, কি ব'লো!

—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত সব কথা বলা চলে না! আয়, আমার চেম্বারে আয়।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সুবিনয় অসীমের অনুগমন করিল।

চেম্বারে পৌঁছিয়া অসীম সোজা প্রশ্ন করিল, তপতীর কি ব্যবস্থা করেছিস?

সুবিনয় একটু থতমত খাইয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল. এখনও ভেবে দেখিনি'!

শ্লেষের সহিত অসীম বলিল. ভেবে দেখিনি'! এর মধ্যে ভাব্‌বার কি আছে রে, সুবিনয়?

সুবিনয় কোন জবাব দিল না। কি জবাব দিবে সে?

অসীম বলিয়া চলিল, তপতী যে আমার কাছে এসেছিল তা' বোধ হয় তুই বুঝতে পেরেছিস্‌। সব কথা তার কাছ থেকে আমি শুনেছি। আমি অবাক্‌ হ'য়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে তপতীকে এই অবস্থায় টেনে নিয়ে এসে কেমন ক'রে তুই অম্লানবদনে বল্‌ছিস্‌, কি করবি তা' এখনও ভেবে দেখিস্‌নি'!

—এখনও ত সময় চ'লে যায়নি', অসীম।. .প্রতিবাদের সুরে সুবিনয় বলিল।

—সময় বেশি নেইও, সুবিনয়। এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি মেয়ে—বিশেষ ক'রে তপতীর মত মেয়ে—কতদিন থাকবে? তোর তপতীকে বিয়ে করতে হ'বে, আর দেরি করা চলবে না!

ক্ষীণকণ্ঠে সুবিনয় বলিল, বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই, অসীম, কিন্তু এখন কথাটা জানাজানি হ'য়ে গেলে তার ফল কি ভয়ানক হ'বে ভেবে দেখেছ কি? রেবার কথা ত তুমি জান!

—বিয়েটা যাতে এখন জানাজানি না হয় সে ব্যবস্থা আমরা করব। আমি ত তোর স্ত্রীরও ডাক্তার—আমি নিশ্চয়ই চাইব না তার শরীরের বর্তমান অবস্থায় সে হঠাৎ একটা শক্‌ পায়! কিন্তু তপতীর দিকটা ত একেবারে উপেক্ষা করলে চলবে না।

—আমি আজই তপতীর কাছে যাচ্ছিলাম, তাকে বলতে যে আমি

তার এবং তার সন্তানের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি তাকে বিয়ে ক'রে। তবে বিয়েটা কখন হবে তা' স্থির ক'রে উঠতে পারিনি'। তোমরা যখন বলছ তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার, আমি কোন আপত্তি করব না।

প্রকৃতপক্ষে সুবিনয় কিন্তু তখন পর্যন্ত স্থিরই করে নাই সে আদৌ তপতীকে বিবাহ করিবে কি না। অসীমের সঙ্গে কথা হইবার পর সে বুঝিতে পারিয়াছিল বিবাহ ছাড়া আর কোন পথ নাই। নিজের সম্ভ্রম, অসীমের বন্ধুত্ব এবং তপতীর শ্রদ্ধা যদি সে এতটুকু কাম্য মনে করে তবে আর বিলম্ব না করিয়া তপতীকে সমাজে একটা সম্মানজনক স্থান দিতেই হইবে।

অসীমের কাছ হইতে বিদায় নিয়া সে ছুটিল স্টেশনের দিকে— তপতীর সঙ্গে দেখা করিতে এবং কথা বলিতে।

অসীমের সঙ্গে সেদিন কথাবার্তার পর তপতী কেবলই ভাবিতেছিল সে কি করিবে। সুবিনয়ের ভীরুতা, তাহার গোপনতার প্রয়াসের জন্য তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তপতীর মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হইলেও অভিযোগের তীব্রতা অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছিল। সে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিতেছিল সুবিনয়কে জীবনের পটভূমি হইতে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে এবং স্বাধীনভাবে একা জীবনপথে চলিবার একটা সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত পথ বাহির করিয়া নিতে। কিন্তু ভ্রূণস্থ সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই সে মাঝে মাঝে বিচলিত বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছিল।

অসীম বলিয়াছে সে যদি তাহার দাবীটা পরিষ্কারভাবে পরিবেশন করে তবে সুবিনয় তাহা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিবে না। হয়ত খুবই সত্য। কিন্তু সুবিনয়ের সম্মুখে দাবীটা উত্থাপন করাটাই কি সব চেয়ে শ্রেয়ঃ হইবে? তাহাকে পত্নীত্বের আসনে বসাইবার যৌক্তিকতা সুবিনয়ের নিজেরই প্রথমে মনে হওয়া উচিত ছিল। তাহা যখন হয় নাই তখন জোর করিয়া সুবিনয়ের কণ্ঠলগ্ন হওয়ার মধ্যে না আছে গৌরব, না আছে ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ বা শান্তির সম্ভাবনা। এইভাবে সুবিনয়কে স্বামীভাবে গ্রহণ করাতে কোন সার্থকতা আছে কি?

যতই দিন যাইতে লাগিল, তপতীর মনে এই সংকল্প দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল যে সুবিনয় যদি এখন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাকে তবু সে রাজী হইবে না। সমাজকে সে ভয় করে না—যে সমাজের শাসন-অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া সে সুবিনয়ের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল, আজ সেই সমাজের ভ্রূকুটির ভয়ে লোকদেখানো বিবাহে সে সম্মত হইবে না। আর, সর্বোপরি, সুবিনয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক সে নিঃশেষে ধুইয়া, মুছিয়া ফেলিবে।

সাত দিন চলিয়া গেল, সুবিনয় আসিল না। যতই দিন যাইতে লাগিল তপতী তাহার সংকল্পে ততই দৃঢ় হইয়া উঠিল।

অসীমের সঙ্গে কথা বলিয়া সুবিনয় যখন তপতীর কাছে পেঁছিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। তপতী শান্ত গম্ভীর মুখে সুবিনয়কে সম্ভাষণ করিল।

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে সুবিনয় বলিতে আরম্ভ করিল, নানা ঝঞ্ঝাটে এ কয়দিন আসতে পারিনি', তপতী। তুমি ভাল ছিলে ত?

–হ্যাঁ।...সংক্ষেপে তপতী জবাব দিল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুবিনয় বলিল, সেদিন তুমি হঠাৎ অমন রাগ ক'রে উঠলে, অবশ্য রাগের কারণ ছিল, তাই আমি স্থির হ'য়ে কোন কথা বলতে পারিনি'।..আমি তোমাকে বিয়ে করব, তপতী, যাতে সমাজ বা লোকের সম্মুখে তোমাকে এতটুকু ছোট হ'তে না হয়।

এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে তপতীর মুখের দিকে তাকাইল।

তপতীর মুখের রেখাবিন্যাস এতটুকু বদ্‌লাইল না। খুব ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সংযতস্বরে সে বলিল, তোমার এই প্রস্তাবের জন্য আমি খুবই

কৃতজ্ঞ, সুবিনয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমিই এখন আর বিয়ে করবার মত মনের অবস্থাতে নেই। তাই তোমার এই উদার উপচারকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হ'লাম।.. তুমি কিছু মনে ক'রো না, সুবিনয়, এই প্রসঙ্গে দু'একটা কথা তোমাকে বলছি। তোমার কাছ থেকে এই প্রকার একটা প্রস্তাবের প্রতীক্ষাই আমি করেছিলাম অনেক আগে না আমি সাতদিন আগেকার কথা বলছি না, তারও আগে, যখন আমি নিঃসঙ্কোচে আত্ম-সমর্পণ ক'রে দিয়েছিলাম তোমার কাছে। সেদিন আমি ছিলাম যৌবনের স্বপ্নে ভরপুর, তোমাকে দেখেছিলাম কল্পনার অঞ্জন দিয়ে। সেই সুযোগময় মুহূর্ত চলে গেছে, আমি এখন সংসারের নির্মমতায় ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি, এবং দেখতে পাচ্ছি প্রিয়জনের স্নেহ বা করুণার উপর নির্ভর না ক'রে আমাকে দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে নিজে। আমি চাই না তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমার জীবনে একটা নতুন জটিলতাব সৃষ্টি করি। তোমার স্ত্রী রেবা, রেবার গর্ভে তোমার সন্তান, এদের প্রতি তোমার কর্তব্য আছে, সে কর্তব্য তুমি ক'রে যাও। মাঝখান থেকে আমাকে জড়িয়ে আরও অশান্তির সৃষ্টি ক'রো না।

সুবিনয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তপতীর শান্ত সংযত কথাগুলি তাহাকে নির্মমভাবে বিদ্ধ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, কিন্তু তোমার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভাবছ না, তপতী?

—ভাবছি বই কি, সুবিনয়। ঐ ত আমার অবস্থার দুঃসহতম কোণ।.. ভেবে ঠিক করেছি, সন্তানকে নিজের রক্ত দিয়ে পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসবার দায়িত্ব যদি গ্রহণ করতে পারি তাহ'লে পরে তাকে মানুষ ক'রে তুলবার ভারও নিতে পারব। আমাদের দেশে, সমাজে নামগোত্রহীন তার যদি স্থান না হয় তাহ'লে তাকে নিয়ে যাব এমন এক দেশে যেখানে লোকে কুলের পরিচয় খোঁজে না, মনুষ্যত্বের পরিচয় খোঁজে।

—কিন্তু তোমার সন্তানের উপর আমার কি কোনই দাবী নেই? আমি কি তাকে মানুষ ক'রে তোলবার ভার নিতে পারি না?

—না, সুবিনয়, আমার সন্তানের উপর তোমার কোন দাবী নেই।

সন্তান আমাদের এসেছে নিঃসহ যৌবনের খেয়ালে, তুমি বা আমি কেউই একে চাইনি'। তবু যা' এসেছে তাকে ভগবানের দান ব'লে গ্রহণ করবার মত শক্তি আমার আছে, কিন্তু তোমার তা' নেই। তা'ছাড়া সন্তানকে তিলে তিলে বড় ক'রে তুলব আমি—আমার শরীরের প্রত্যেকটি বিন্দু রক্ত দিয়ে, এর মধ্যে তোমার অবদান থাকবে অত্যন্ত সামান্য।...না, সুবিনয়, আমার বোঝা আমি নিজেই বহন করব, তোমার সাহায্যের প্রার্থী আমি হ'তে চাই না!

বিষাদখিন্ন কণ্ঠে সুবিনয় বলিল, তার মানে তুমি আমাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিচ্ছ, তপতী!

--চিরদিনের জন্য কি না বলতে পারি না, সুবিনয়, তবে বেশ কিছুদিনের জন্য ত নিশ্চয়ই। ভবিষ্যতের গর্ভে কি লেখা রয়েছে তা' আমরা কেউই জানি না, কাজেই সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন মাথা ঘামানোর কোনই অর্থ হবে না। এখন আমি শুধু ভাব্ব সামনের কয়েকটা মাসের কথা। এবং এইখানে তোমার কাছে আমার একটি অত্যন্ত কাতর অনুরোধ আছে, আশা করি তুমি রাখবে।

-কি ব'লো।

আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে না ডাকি তুমি আমার কাছে আর এসো না। আমি এখন একা থাকতে চাই—মানুষের সঙ্গ, পৃথিবীর জটিলতার আবর্ত, আমাকে পাগল ক'রে তুলবে, আশা করি তুমি আমার ইচ্ছাটুকু মেনে নিতে পারবে।

—কিন্তু তোমার তত্ত্বাবধান কে করবে, তপতী? তোমার শরীরের এই অবস্থায় একেবারে একা থাকা কোনপ্রকারেই সমীচীন হ'বে না যে!

—আমার জন্য তুমি ভেবো না। ভগবান আছেন, তা'ছাড়া আমার বিশ্বাস ডাঃ রায় প্রয়োজন হ'লে আমাকে সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমার কোন খবর জানতে যদি তোমার ইচ্ছা করে তাঁর কাছেই পাবে।

রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতায় তপতীর কথাগুলি কেমন যেন অনৈসর্গিক, অদ্ভুত এক রূপ ধরিয়া সুবিনয়ের কাণে বাজিতে লাগিল। আর কোন প্রতিবাদ বা তর্ক করিবার মত সাহস সে হারাইয়া ফেলিল, সে চুপ করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল।

তপতী বলিল, অনেক রাত হ'য়ে যাচ্ছে—শেষের ট্রেনটার আর বেশি বাকী নেই, তুমি এবার উঠে পড়ো, সুবিনয়।

দ্বিধাকম্পিতস্বরে সুবিনয় প্রশ্ন করিল, যাবার আগে আমাকে একবারটি প্রিয়সম্ভাষণ করবে না, তপতী?

ঈষৎ হাসিয়া তপতী বলিল, প্রিয়সম্ভাষণ তোমাকে অনেক করেছি, সুবিনয়, পুনরাবৃত্তি করতে আর রুচি নেই। তা'ছাড়া, যদি সত্যি কথা বলতে বলো, তাহ'লে আমাকে বলতে হয়, অভিনয়ে আমার দক্ষতা কোন-দিনই ছিল না, অভিনয়ের মধ্যে অংশ নিতে আমি পারব না।

বেত্রাহত সুবিনয় ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল এবং একবার তপতীর দিকে তাকাইয়া দরজাটা খুলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

তপতী অনেকক্ষণ পর্যন্ত একই ভাবে পথের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিল।

পরের দিন সুবিনয় নিজেই গেল অসীমের কাছে। তপতীর সঙ্গে আগের রাত্রিতে তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা সে খুলিয়া বলিল।

অসীমের মন তপতীর প্রতি স্নেহে শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। প্রথম হইতেই তপতীকে তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল, তাহার ভালবাসা পাইবার লিপ্সা এবং যৌবনের আকুলতা ভেদ করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছিল অন্তরের মানুষটিকে। আজ তপতীর এই নূতন রূপের পরিচয় পাইয়া সে আরও মুগ্ধ হইল।

বলিল, আমার মনে হয় তপতী যা' বলেছে তোর সেই ভাবেই চলা উচিত। তুই এখন ওর বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোর স্ত্রীর দিকে একটু নজর দে' দেখি! বেচারী তোর বিচিত্র মনোভাবের কোনই কূলকিনারা পাচ্ছে না।

অবাধ্যতার সুরে সুবিনয় বলিল, কিন্তু তপতীর সন্তানের উপর

আমার কোন নৈতিক দাবীও কি নেই, অসীম? কেন সে আমাকে এইভাবে দূরে ঠেলে রাখবে? আমি ত তাকে বিয়ে করতেও রাজী আছি।

—সুবিনয়, বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে মেয়েদের সব ব্যবহার বিবেচনা করতে যাস্ নে। দাবীদাওয়ার কথা ভুলে যা'—তুই মনে কর্ তপতীর সঙ্গে তোর জীবনের অধ্যায় শেষ হ'য়ে গেছে।

—রেবা কিন্তু কখনও এমন অযুক্তিকর ব্যবহার করতে পারত না।... ফস্ করিয়া সুবিনয় বলিয়া বসিল।

অসহিষ্ণুভাবে অসীম জবাব দিল, তোর স্ত্রীর সঙ্গে তপতীর তুলনা করতে যাস্ নে সুবিনয়, তাতে তপতীর প্রতি শুধু অবিচার নয়, অসম্মান করা হ'বে।. তোর দুর্ভাগ্য, তপতীকে একান্ত কাছে পেয়েও তুই হারালি'। এখন নীরবে এই দুর্ভাগ্যটা মেনে নিতে শেখ্।

—তোমার কাছ থেকে তপতীর খবর মাঝে মাঝে পাব ত, অসীম?

—নিশ্চয়ই। আমি আজই যাচ্ছি তার কাছে, তার সব ব্যবস্থা ক'রে দিতে। তোর মুখাপেক্ষী হ'যে সে থাকবে না বিশেষ ক'রে আমি যখন নাগালের মধ্যেই রয়েছি।

সুবিনয় আর কোন কথা না বলিয়া সেদিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিল।

তপতীর কাছে যাইয়া কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়াই অসীম বলিল, আজ সকালে সুবিনয় এসেছিল, তার কাছে সব শুনলাম।

শঙ্কিত চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া তপতী প্রশ্ন করিল, আপনি রাগ করেন নি' ত, ডাঃ রায়? আমি আপনার উপদেশটা শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে পারলাম না।

সস্নেহে তপতীর কাঁধের উপর ডান হাতটা রাখিয়া অসীম বলিল, আমি রাগ করিনি', তপতী, বরং খুসীই হয়েছি। নিজেরই অজ্ঞাতে আমি বোধ হয় আশা করছিলাম তুমি আমার অবাধ্য হ'বে।

অনেকদিন পরে সামান্য এই অভিনন্দনটুকু পাইয়া তপতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অসীম বলিল, সুবিনয়কে আমি ব'লে দিয়েছি যে তোমার সম্পূর্ণ ভার নিচ্ছি আমি। এখন কথা হচ্ছে এই, এতখানি দূরে যদি তুমি থাক তাহ'লে তোমার দায়িত্ব গ্রহণ আমি করি কি ভাবে? তাই আমি তোমাকে বলতে এসেছি, তোমাকে কল্‌কাতায় ফিরে যেতে হবে।

—কিন্তু সেখানে আমি কোথায় থাকব? কল্‌কাতার পরিচিত আব্‌হাওয়ার চেয়ে এই গণ্ডগ্রামের নির্জনতা যে আমার পক্ষে এখন অনেক বেশি সুবিধাজনক, ডাঃ রায়।

—সেটা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু তাহ'লে যে আমাকে এসে এখানে থাকতে হয়!

—না না, আপনার থাকবার কোনই প্রয়োজন হবে না। শুধু আপনি মাঝে মাঝে, সপ্তাহে হপ্তায় একবার এসে আমার খোঁজ নেবেন, তাহ'লেই আমি নিশ্চিন্ত নির্ভরে থেকে যেতে পারব।

—উঁহু, সে হয় না! দশ মাইল দূর থেকে তত্ত্বাবধান করা অসম্ভব! তাহ'লে এক কাজ করা যাক্‌, তপতী। আমার চেম্বার কল্‌কাতায় যে-রকম আছে সেইভাবেই থাকুক, শুধু আমি এখান থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করি। অবশ্য ট্রেনের ভরসায় আমাকে বসে থাকতে হবে না, কারণ আমার নিজের গাড়ি রয়েছে।

—না, না, আমার জন্য এরকম অসুবিধার মধ্যে আপনাকে পড়তে আমি কিছুতেই দেব না! বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই তপতী বলিল।

—তুমি তোমার শরীরের অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারছ না তপতী। আমি ডাক্তার, আমি জানি। আমার কোনই অসুবিধা হবে না যদি আমি রোজ এখান থেকে কল্‌কাতায় যাওয়া-আসা করি।

বার বার তাহার শরীরের অবস্থার উল্লেখে তপতী অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিতেছিল। সে দেখিল অসীমের সঙ্গে তর্ক করা নিরর্থক, সে যতই আপত্তি করিতে থাকিবে অসীমের জেদ ততই বাড়িয়া যাইবে। বিষয়টা একপ্রকার নিষ্পত্তি করিবার প্রয়াস করিয়া সে বলিল, আচ্ছা আপনার আদেশই আমি শিরোধার্য ক'রে নিচ্ছি, কিন্তু এখখুনি আপনার এখানে চলে আসবার প্রয়োজন নেই, দু'দিন পরে ধীরেসুস্থে না হয় আসবেন।

—এবার তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা বলছ। হাসিয়া অসীম বলিল।

অসীম চলিয়া গেল। তপতী কেবলই ভাবিতে লাগিল এই লোকটির অদ্ভুত চরিত্রের কথা। সাধারণ লোকের মাপকাঠিতে ডাঃ রায়কে কিছুতেই বিচার করা চলে না। পৃথিবীর যে কোন লোক সুবিনয়ের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা শুনিয়া তাহাকে পরিহার করিয়া চলিবে, তাহাকে ঘৃণা করিবে কিন্তু ডাঃ রায়ের ব্যবহারের মধ্যে ঘৃণার চিহ্নমাত্রও নাই বরং তাঁহার প্রত্যেকটি কথায় আচরণে, স্নেহ এবং বোধ হয় খানিকটা শ্রদ্ধাও ঝরিয়া পড়িতেছে। সুবিনয় পর্যন্ত দূরে সরিয়া যাইতে বিশেষ কোন দ্বিধা করিল না, অথচ ডাঃ রায় তাহার মধ্যে এমন কি দেখিলেন যে ক্রমশঃ আরও নিকটে তিনি চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ভাবিতে ভাবিতে তপতীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে এতদিন ডাঃ রায়ের স্নেহের যথোপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারে নাই, যে নির্লিপ্ততা এবং ঔদাসীন্যের সহিত এতদিন সে ডাঃ রায়ের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে তাহাতে তাহার নিজের স্বার্থান্বেষেরই প্রকাশ হইয়াছে। সে স্থির করিল ডাঃ রায়ের স্নেহ এবং শ্রদ্ধার উপযুক্ত হইতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে তাহার ভবিষ্যৎ ব্যবহার দ্বারা সে বুঝাইয়া দিবে ডাঃ রায় তাহাকে যতখানি স্বার্থান্বেষী এবং সুবিধাবাদী মনে করেন আসলে সে ততখানি স্বার্থান্বেষী এবং সুবিধাবাদী নহে।

তপতীর নিকট হইতে একপ্রকার বিতাড়িত হইয়া সুবিনয় আবার শান্তি খুঁজিতে চেষ্টা করিল তাহার গৃহে—রেবার আলিঙ্গনে। তপতীর ব্যবহার তাহার কাছে মনে হইল অহেতুকভাবে নিষ্ঠুর এবং স্বার্থপূর্ণ। তাহার বিবাহের প্রস্তাব এত অকুণ্ঠিতভাবে তপতী প্রত্যাখ্যান করিল—এবং তাহার আশ্রয় উপেক্ষা করিয়া সে অসীমের আশ্রয়প্রার্থী হইল ইহাতে সে

অনেকখানি আহত এবং অপমানিত বোধ করিল। তাহার মনে হইল তপতী তাহার ভালবাসার যথোচিত মর্যাদা দিতে পারে নাই, সে তপতীর প্রতি এমন অন্ধভাবে আসক্ত হইয়া প্রকাণ্ড একটা ভুল করিয়াছে।

বলা বাহুল্য, স্বামীর মানসিক পরিবর্তন রেবা লক্ষ্য করিল। সে দেখিল সুবিনয় আবার আগের মত তাহার প্রতি যত্নপরায়ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহার ছোটখাট স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা-অসুবিধাগুলির দিকে মনোযোগ দিতেছে। বিবাহের অব্যবহিত পরে স্বামীর ভালবাসার মধ্যে যে উচ্ছ্বাস এবং নির্ভরতা সে অনুভব করিয়াছিল তাহা ফিরিয়া না আসিলেও সে সুখী হইল এই দেখিয়া যে বাড়ি এবং বাড়ির গৃহিণীর প্রতি স্বামীর মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

ইতিমধ্যে নাযেবসমভিব্যাহারে ব্রজমোহনবাবুও আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রথমেই তিনি তিরস্কার করিলেন পুত্রকে—কেন সে পুত্রবধূর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি একটু বেশি নজর দিয়া অতিরিক্ত দুই-একটি চাকর বা ঝি নিযুক্ত করে নাই। রায়বংশের প্রথম পুত্রসন্তান—তাঁহার পৌত্র—পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে যেন অনুভব করে তাহার প্রতি সম্যক যত্ন এবং মর্যাদা প্রকাশ করা হইতেছে। তাহাছাড়া, সুবিনয়ের অর্থেরই বা অভাব কি? তাঁহার (ব্রজমোহনবাবুর) এত সঞ্চিত টাকা কোন্ ভূতে খাইবে? সুবিনয় কি তাহার ছোট অন্ধকার বাড়িটা পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটা অপেক্ষাকৃত ভাল বাড়িতে উঠিয়া যাইতে পারে না?

সুবিনয় বলিল, এ বাড়িটা এমন আর খারাপ কি, বাবা?

—খারাপ নয়? তোমার কোন চোখ আছে সুবিনয়? সমস্ত বাড়িতে ঘর ত মাত্র চারটি, আর তার একটির মধ্যে মাত্র আলোর মুখ দেখতে পাওয়া যায়, আর সবই অসূর্যম্পশ্যা! না, না, এখানে বৌমার কিছুতেই থাকা চলবে না।

সুবিনয় তবু বলিল, কিন্তু এখন আবার বাড়ি বদ্‌লাতে হ'লে হ্যাঙ্গামও ত কম হ'বে না। তা'ছাড়া আপনি যে জাতীয় বাড়ির কথা, বলছেন তার ভাড়া এই বাড়ির ভাড়ার অন্ততঃ দ্বিগুণ হ'বে।

বাড়ির ভাড়ার কথার উল্লেখে ব্রজমোহনবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, বাড়ির ভাড়ার ভার সম্পূর্ণ আমার, আমি এই ব্যবস্থা করছি শুধু বৌমা এবং দাদুর জন্য। তোমার যদি নতুন বাড়িতে যেতে ইচ্ছা না করে, যেয়ো না। আর হ্যাঙ্গামের কথা বলছ, বিপ্রদাস যখন আমার সাথে রয়েছে সব হ্যাঙ্গামের তত্ত্বাবধান সেই করতে পারবে।

অবশ্য সুবিনয় ইহা কখনই চায় নাই যে রেবা অন্য এক বাড়িতে চলিয়া যাইবে এবং সে তাহার বর্তমান গৃহে থাকিবে। সে পিতার একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়াছিল এই ভাবিয়া যে রেবার শরীরের এই অবস্থায় গৃহপরিবর্তনের হ্যাঙ্গামাটা হয়ত ক্ষতিকর হইতে পারে। কিন্তু পিতা যখন সেই দায়িত্বটা বিপ্রদাসবাবুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন তখন সুবিনয়ের আপত্তি করার আর কোনই কারণ রহিল না।

ব্রজমোহনবাবু নায়েবকে ডাকিয়া বলিলেন, নায়েবমশায় আপনি এখখুনি আপনার চাদরটা নিয়ে বেরিয়ে যান। এই অঞ্চলেই বড় আলো-বাতাস খেলে এবং সামনে একফালি জায়গা থাকে এমন অন্ততঃ ছয় সাত-ঘরওয়ালা একখানা বাড়ি খুঁজে পাকা বন্দোবস্ত করে আসুন। আমরা কাল-পরশুই আপনার ঠিক করা বাড়িতে উঠে যেতে চাই।

যে আজ্ঞে। বলিয়া বিপ্রদাসবাবু প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

হ্যাঁ, আর এক কথা। ফেরার পথে কোন ফার্নিচারের দোকানও ঘুরে আসবেন। নতুন বাড়িতে এখানকার পুরানো আসবাবপত্র নিয়ে যাবার কোনই অর্থ হয় না।

ব্রজমোহনবাবুর এই অপ্রত্যাশিত মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া বিপ্রদাসবাবু সত্যসত্যই বেশ বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বুঝিলেন বৃদ্ধের এই বদান্যতার পেছনে লুক্কায়িত রহিয়াছে পৌত্রমুখ সন্দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে সুবিনয়কে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের করতলগত করিতে পারেন নাই তাহার পুত্রের জন্মের পূর্ব হইতেই তাঁহার নিজের দাবী প্রচার করার আকুল প্রয়াস।

সুবিনয়ও তাহার পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিয়া সে হাসিল, কারণ তাহার অভিজ্ঞতার সীমানার মধ্যে সে চিরকালই দেখিয়া আসিয়াছে যে পিতা বেশ উদার হস্তে অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন

তখনই যখন তিনি বুঝিতে পারেন নিয়তি তাঁহার মনের গোপন ইচ্ছামত সুবিনয়ের জীবন নির্ধারণ করিয়া দিতেছে।

এইভাবে সুবিনয়ের জীবন আবার শান্তপ্রবাহে চলিতে আরম্ভ করিল। তপতীর সঙ্গে তাহার পুনরায় সাক্ষাৎ, তৎপর তাহার দ্বৈতজীবন, এই সব ঘটনার স্মৃতিই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিবেকের দংশন যে তাহাকে উদ্বেল করিয়া তুলিত না এমন নয়, কিন্তু সে নিজের আচরণ সমর্থন করিল এই বলিয়া যে সে সর্বদা যথোপযুক্ত স্বার্থ-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল, তপতীই এ বিষয়ে তাহাকে কোন সুযোগ দেয় নাই!

ফল হইল এই যে সে তাহার স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা নিঃশেষ করিয়া তুলিয়া নিয়া আসিল তপতীর কাছ হইতে এবং তাহা অর্পণ করিতে চেষ্টা করিল রেবার উপর। কামনাব ব্যর্থতা তাহাকে করিয়া তুলিল আরও অন্ধ, আরও ভীরু।

রেবা সুবিনয়ের মনের এই সব বিচিত্র লীলা বুঝিল না, বুঝিবার শক্তিও তাহার ছিল না। সে কৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করিল সুবিনয়ের পরিচর্যা—তাহার প্রতি সুবিনয়ের নূতন ছাঁচে ঢালা সস্নেহ ব্যবহার।

তপতীর কি হইল তাহা ভাবিয়া সময় এবং চিন্তাশক্তি নষ্ট করা সুবিনয়ের কাছে মনে হইল প্রকাণ্ড একটা অপব্যয়। তপতী কোথায় আছে, কি করিতেছে সে সম্বন্ধে কোন নিয়মিত সন্ধান নেওয়ার অভ্যাসটাও সে ধীরে ধীরে বর্জন করিল।

এদিকে অসীম তাহার প্রতিশ্রুতিমত তপতীর ওখানে যাইয়াই বসবাস সুরু করিল। তপতীর কোন আপত্তি বা ওজর সে শুনিল না, বলিল, আমি ডাক্তার, তোমার চেয়ে আমি ভাল জানি এখন তোমার কাছে কোন অভিজ্ঞ লোকের থাকার প্রয়োজন আছে কি না।

অসীম তপতীর কাছে থাকিতে আরম্ভ করিল সত্য, কিন্তু সুবিনয় সম্পর্কে কোন প্রকার ঔৎসুক্য সে প্রকাশ করিল না।

তপতী সুবিনয় সম্বন্ধে কি ভাবিতেছে, তাহার মনের গতির কোন পরিবর্তন হইতেছে কিনা, এসম্বন্ধে সে রহিল সম্পূর্ণ নির্বিকার। তপতীর সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করিতে লাগিল যে বাহিরের কোন লোক দেখিলে মনে করিত তপতী বোধ হয় অসীমের ছোট বোন্, স্বামীপরিত্যক্তা হইয়া অসীমের কাছে আশ্রয় নিয়াছে এবং অসীম প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহার দুঃখিনী বোন্‌টিকে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে।

তপতীও ভাবিতে সুরু করিয়াছিল। সুবিনয়ের সান্নিধ্য হইতে দূরে চলিয়া আসিয়া সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতেছিল তাহার নিজের মনের প্রত্যেকটি গতি, সুবিনয়কে কেন্দ্র করিয়া তাহার হাসি-উল্লাস এবং সুখ-দুঃখের প্রত্যেকটি স্মৃতি। সময় এবং ব্যবধানের দূরত্বের সহায়তা পাইয়া নিজেকে এবং সুবিনয়কে নূতন রূপে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ সে পাইয়াছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তগুলি সে কাটাইয়াছে উপগ্রহের মত। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সে এতদিন ঘুরিল, না পাইল তাহার কাছে থাকিবার অধিকার, না পাইল তাহাকে নিষ্করুণভাবে বর্জন করিবার সাহস। মাসের পর মাস নিজের দেহটাকেই সে আগাইয়া দিয়া আসিয়াছে যৌবনের দুর্নিবার স্রোতে, একবারও ভাবিয়া দেখিবার সময় বা প্রবৃত্তি তাহার হয় নাই যে যাহার কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিতেছে সে তাহার মনটার দিকে তাকাইতেছে কি না। যে অভিজ্ঞতা আজ জন্মিল তাহা ব্যবহার করিবার সুযোগ বা সময় আর তাহার হইবে কি?

একটা বিষয়ে তপতীর এতটুকু ক্ষোভ বা অনুশোচনা ছিল না। তাহার ভালবাসার সম্যক্ মর্যাদা সুবিনয় না দিতে পারে, কিন্তু সে নিজে যে নিছক প্রবৃত্তির তাড়নায় সুবিনয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে নাই, একথা জোর গলায় পৃথিবীর সম্মুখে প্রচার করিবার মত সাহস এবং বিশ্বাস তাহার ছিল। তাই দুঃখ এবং অবসাদের মধ্যেও তপতীর আত্মনির্ভরতা এতটুকু কমিল না। তবে, মাঝে মাঝে বিগত দিনের স্মৃতি, নিজেরই টুকরা টুকরা কথার অনুরণন, তাহার মনের কোণে ভাসিয়া উঠিত এবং সে ভাবিত, কি প্রকাণ্ড এক স্বপ্ন হইতে সে জাগিয়া উঠিয়াছে!

মুখে কোন কথা না বলিলেও অসীম তীক্ষ্ণভাবে তপতীকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে বুঝিয়াছিল, তপতীর মত মেয়েকে বাহিরের লোকে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে শান্ত করিতে পারিবে না—সে শান্ত সমাহিত হইবে নিজেরই মনের জোরে, বিগত আচরণের উপর নিজেরই বুদ্ধির আলোকসম্পাত করিয়া। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে শীঘ্রই তপতী সুবিনয়কে তাহার নগ্ন পরিচয়ে দেখিতে পারিবে, বাহিরের কোন ইঙ্গিত বা প্ররোচণার প্রয়োজন হইবে না।

অসীম যতখানি আশা করিয়াছিল তপতী ঠিক ততখানি নিষ্করুণ-ভাবে সুবিনয়কে বিচার না করিলেও সুবিনয়ের প্রতি তাহার ভালবাসার উৎস প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল। ভুল, প্রকাণ্ড একটা ভুল সে করিয়াছে, যে ভুলের দায়, দায়ী প্রধানতঃ সে নিজে, ইহাই তাহার মনে বার বার প্রতিধ্বনিত

এইভাবে আরও কয়েকটা মাস কাটিয়া গেল। রেবা এবং সুবিনয়কে নূতন বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া ব্রজমোহনবাবু ও নায়েবমহাশয় গ্রামে প্রস্থান করিলেন। যাইবার পূর্বে তিনি বার বার সুবিনয়কে অনুরোধ জানাইয়া গেলেন সে যেন রেবার যত্ন নেয়—সুবিনয়ের সন্তানের জননী হইতে যাইতেছে সে!

পিতার এই সস্নেহ উদ্বেগপ্রকাশে সুবিনয় সত্যই খুসী হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে তাহার যে সমস্ত ছোটখাট অভিযোগ সঞ্চিত ছিল তাহা অনেক পরিমাণে উবিয়া গেল। পিতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া জানাইল যে তাঁহার আদেশ উপদেশ পালন করিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

তপতীর সংবাদ সে ইতিমধ্যে প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ দুই তিনবার

নিয়াছিল। সোজা তপতীর কাছে যাইতে সে সাহস পায় নাই, অসীমের নিকট সে খবর নিয়াছিল। তপতীকে নিয়া সুবিনয়ের সঙ্গে কোন তর্ক আলোচনা করিতে অসীম চেষ্টা করে নাই বা সুবিনয়কে একবারও বলে নাই যে সে নিজে যাইয়া তপতীর কুশলপ্রশ্ন করিলেও পারে। যতবারই সুবিনয় তাহার কাছে আসিয়াছে সে সংক্ষেপে তাহাকে জানাইয়া দিয়াছে যে তপতী ভাল আছে এবং উল্লেখযোগ্য কোন সংবাদই নাই।

অসীমের এই নির্লিপ্ত শান্ত ব্যবহারে সুবিনয়ের মনে বিরক্তি এবং রাগ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল। অসীম তাহাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর সম্মুখে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে এই প্রকার একটা ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সে অসীমের সঙ্গে একটা বৈষম্য সৃষ্টি করিতে সাহস পাইতেছিল না, কারণ, প্রথমতঃ, সে চিরকালই অসীমকে অদ্ভুত ভয় করিয়া আসিয়াছে, এবং দ্বিতীয়তঃ, সে বুঝিয়াছিল যে অসীম যদি একবার তাহার বিরুদ্ধে বাঁকিয়া বসে তবে রেখার সঙ্গে তাহার পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

মাঝে মাঝে তাহার কৌতূহল হইত তপতীর সঙ্গে যাইয়া দেখা করে, সে কি ভাবিতেছে তাহার একটুখানি আভাষ নেয়। কিন্তু অসীম যে সেখানে যাইয়া আস্তানা গাড়িয়াছে, কে জানে তাহার তপতীকে সম্ভাষণ করাটা অসীম কতদূর পছন্দ করিবে! অসীমের রোষ বা বিরক্তি উদ্রেক সে কিছুতেই এখন করিতে পারে না!

অবশেষে একদিন নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া সে মধ্যাহ্নের ট্রেনে চলিয়া গেল তপতীর ওখানে। সে জানিত সকাল দশটার মধ্যে সেই যে অসীম কলিকাতায় তাহার চেম্বারে চলিয়া আসে তাহার পর তাহার ফিরিতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়।

অত্যন্ত সন্তর্পণে ভীত লঘুপদক্ষেপে সে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কড়া নাড়িল।

তপতী তখন সবেমাত্র খাওয়া-দাওয়া করিয়া উঠিয়াছে। তাহার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অস্বস্তিও বাড়িতেছে। এই

দ্বিপ্রহরে কে তাহাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছে? সে চাকরকে ডাকিয়া বলিল, দেখ্ ত, কে এসে কড়া নাড়ছে!

চাকর বাহিরে যাইয়া সুবিনয়কে দেখিয়াই পলকের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তপতীর কাছে আসিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, সুবিনয়বাবু এসেছেন, মা!

সুবিনয়! হঠাৎ তপতীর কাণের কাছে রক্ত ছুটিয়া আসিল। তাহার বুকে অস্বাভাবিক এক তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইল।

কোনপ্রকারে নিজেকে একটু সাম্‌লাইয়া নিয়া তপতী বলিল, যা', দরজা খুলে দে', আর বল্ আমি একটু পরে আস্‌ছি।

তপতী শুনিতে পাইল চাকর দরজা খুলিয়া দিল এবং সুবিনয় আসিয়া পাশের ঘরে বসিল। সুবিনয় চাকরকে কি যেন প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাহা এত মৃদুস্বরে যে তপতী কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বেশ কয়েক মিনিট তপতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল। একি নিয়তির পরিহাস? আজ ছয়মাসের মধ্যে সে নিজেকে অনেকখানি সাম্‌লাইয়া নিয়া আসিয়াছে। যদিও তাহার মাঝে মাঝে মনে হইয়াছে পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহাকে একাকী অজানা এক দেশে ফেলিয়া রাখিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে তবু সেজন্য সে তেমন কোন দুঃখ অনুভব করে নাই। কিন্তু আজ হঠাৎ দুঃস্বপ্নময় উল্কার মত সুবিনয় আবার আসিয়া উপস্থিত হইল কেন?

একবার তাহার মনে হইল সে চাকরকে দিয়া বলিয়া পাঠায় যে তাহার শরীর অসুস্থ, সে দেখা করিতে পারিবে না। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার খেয়াল হইল তাহার চাকরেরা সুবিনয়কে খুব ভালভাবেই জানে, ছয়মাস পূর্বে তাহার ঘন ঘন আসা-যাওয়ার কথা তাহারা নিশ্চয়ই ভুলিয়া যায় নাই, এখন তাহার সুবিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং অস্বাভাবিক মনে হইবে।

বুকে সাহস বাঁধিয়া পর্দাটা ঠেলিয়া সুবিনয় যে ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুবিনয় ইতিমধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল তপতীকে

কি ভাবে সম্ভাষণ করিবে। কিন্তু তপতী যখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার শান্তগম্ভীর মূর্তি দেখিয়া সে কোন কথাই বলিতে পারিল না। বেশ খানিকক্ষণ পরে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল, তুমি কেমন আছ খবর নিতে এলাম।

—ভালই আছি।. সংক্ষেপে তপতী জবাব দিল।

—অসীমের কাছে অবশ্যি প্রতি হপ্তায়ই তোমার খবর পাই, কিন্তু তবু ভাব্‌লাম নিজে গিয়ে তোমাকে একবার দেখে আসি।

তপতীর ইচ্ছা হইল বলে, এতখানি উৎকণ্ঠা প্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না, সুবিনয়। কিন্তু অতিকষ্টে সে লোভসম্বরণ করিল।

—তোমার যদি কোন বিষয়ে কোন সাহায্যের প্রয়োজন থাকে আমাকে জানিয়ো।

তবু তপতী কোন কথা বলিল না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুবিনয় বলিল, আর সংকটের সময়ে আমি যেন একটা খবর পাই। তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না জানি, তোমার কথা আমার সব সময়ই মনে হয়।

তপতীর ঠোঁটের আগায় অনেক কথাই আসিয়াছিল, কিন্তু সে আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দুই-একটা কথা ছাড়া অন্য কোন কথাই বলিবে না।

সুবিনয় বোধ হয় অপেক্ষা করিতেছিল তপতী অন্তত কোন অভিযোগ করিবে এবং তাহার উত্তরে সে স্বপক্ষে কয়েকটা কথা বলিতে পারিবে। তপতী তাহাকে কোনই সুযোগ দিল না।

সুবিনয় আবার বলিল, অসীমের মারফৎ আমাকে খবর দিতে ভুলো না যেন, তপতী।

তপতী আর সহ্য করিতে পারিল না। বেশ একটু শ্লেষের সহিতই জবাব দিল, সন্তান তোমারও, সে পৃথিবীতে এলে তুমি নিশ্চয়ই খবর পাবে!

সুবিনয় বুঝিল আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং যাইতে যাইতে বলিল, দুপুরবেলা তোমার বিশ্রামের সময় এসে তোমাকে বিরক্ত কর্‌লাম, ক্ষমা ক'রো।

সুবিনয় চলিয়া গেল। দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়া তপতী সোজা ঢুকিল তাহার শয়নকক্ষে। যদিও সুবিনয়ের সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত দুই-একটা কথা ছাড়া অন্য কোন বাক্যবিনিময় সে করে নাই তবু শ্রান্তিতে সে অবসন্ন বোধ করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া কাহারও সঙ্গে অহেতুক তর্ক করিয়া সে আসিয়াছে, যাহার ক্লান্তি তাহার সমস্ত শরীর ও মনকে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে।

সুবিনয়ের কথা মনে হইতেই তাহার সমস্ত সত্ত্বা বিরক্তি ও ঘৃণায় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। সহানুভূতি প্রকাশের অন্য কোন সুষ্ঠু বা সুচারু উপায় কি সে খুঁজিয়া পাইল না? কেন সুবিনয় এই অতি সহজ সত্যটা বুঝিতে পারিতেছে না যে আজ তপতী তাহার নিকট হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে– জীবনপথের অসংখ্য যাত্রী এবং পথিকের মধ্যে সে অত্যন্ত নগণ্য পরিচিত একজন মাত্র। সুবিনয়ের সঙ্গে যে তাহার কোনদিন অন্তরঙ্গতা ছিল, সে যে সুবিনয়ের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, ইহার প্রত্যেকটি স্মৃতিই আজ তাহার কাছে বিষাদময়!

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে অসীম কলিকাতা হইতে ফিরিল। বাড়িতে কোন বাতি জ্বালা হয় নাই, তপতী তখনও ঘরে শুইয়া আছে—অসীম সত্যসত্যই উদ্বিগ্ন বোধ করিল।

তপতীর ঘরের দরজার সম্মুখে যাইয়া ডাকিল, তপতী!

কোন সাড়া সে পাইল না, কারণ শ্রান্তিতে অবসন্ন তপতী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

অসীম অবার ডাকিল, তপতী, তুমি এখনও শুয়ে আছ?

এবার তপতীর ঘুম ভাঙ্গিল। ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া সে বলিল, কে, ডাঃ রায়? আমি এখ্‌খুনি আস্‌ছি।

বেশভূষা একটু সংযত করিয়া তপতী বাহির হইয়া আসিল। লজ্জিত কণ্ঠে বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে বুঝ্‌তেও পারিনি'।

যথার্থ উদ্বেগের সহিত অসীম প্রশ্ন করিল, কিন্তু তোমার মুখটাও ত কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো ঠেক্‌ছে! জ্বর হয়নি' ত?

—না, না, আপনি বড্ড বেশি ভাবেন।...তপতী বলিল।

অসীম এই উত্তরে খুসী হইল না। তপতীর বাঁ হাতটা টানিয়া নিয়া তাহার নাড়ীটা পরীক্ষা করিয়া বলিল, জ্বর হয়ত হয়নি', কিন্তু তোমার শরীরের অবস্থা ঠিক যেমনটি থাকা উচিত ছিল তেমনটি ত দেখ্‌ছি না। একটু শোও দেখি, তোমার বুকটা ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে হবে।

তপতী প্রতিবাদ করিল, কিন্তু অসীম তাহার আপত্তি শুনিল না। পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরমুখে বলিল, একজন নার্সের শীগ্‌গীরই বন্দোবস্ত করতে হ'বে, তপতী, কখন কি হয় বলা যায় না।

তাহার পর চিন্তিতমুখে অনেকটা যেন আপন মনে বলিল, কিন্তু আজ হঠাৎ এমন হ'ল কেন বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তপতী বলিল, আজ সুবিনয় এসেছিল'

বিস্মিতস্বরে অসীম বলিল, সুবিনয়' কেন?

আমার খবর নিতে।

—তার মানে?

সংক্ষেপে তপতী সুবিনয়ের আকস্মিক আবির্ভাব এবং তাহার পর তাহার সঙ্গে কথোপকথনের ইতিবৃত্ত বলিল।

অসীম অত্যন্ত বিরক্ত এবং রাগান্বিত হইল। বলিল, লোকটার স্পর্ধার সীমা নেই! কোথায় লজ্জায় দূরে প'ড়ে থাকবে, কিন্তু ওর নির্লজ্জতা সাধারণ বুদ্ধিকেও অতিক্রম ক'রে গেছে!. কালই আমি তাকে বুঝিয়ে দেব আমাদের সে ছেলেমানুষ পায়নি', আর তার খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য আমরা সব সময়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকিনে'

অনুনয়ের কণ্ঠে তপতী বলিল, কি আর হবে কলহের সৃষ্টি ক'রে, ডঃ রায়? এসব নির্বুদ্ধিতাকে উপেক্ষা করাই সব চেয়ে ভাল, নয় কি?

—যা তোমার অভিরুচি!...উদাসভাবে অসীম জবাব দিল।

কাতরভাবে তপতী বলিল, কেবল আমার অভিরুচির উপর সমস্ত দায়িত্ব চেপে দেবেন না, ডাঃ রায়। আপনিই ভেবে দেখুন, আপনি যদি কাল সুবিনয়কে তার আমার কাছে আসা নিয়ে অনুযোগ করেন তাহ'লে

অনর্থক একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমাকে নিয়ে আপনার বন্ধুর সঙ্গে আপনার সম্প্রীতি নষ্ট হয় এটা আমি চাইনে।

সুদীর্ঘ ছয়সাত মাস অসীম সুবিনয়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলে নাই বা সুবিনয়কে নিয়া তপতীর সঙ্গে কোন আলোচনা করে নাই। আজ তাহার মূক মুখে ভাষা ফুটিল।

সে বলিল, সুবিনয়কে আমি সত্যি ভালবাসতাম, তপতী, এবং এখনও বোধ হয় ভালবাসি। তুমি জাননা চিরদিন তাকে আমি কত বড় মূর্খতা, কত প্রকাণ্ড বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যখন আমি ভাবি সে তোমার সম্পর্কে কত বড় কাপুরুষ তখন আমার রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে' আর ভাবি. ভগবানেব একি বিচিত্র লীলা যে কোথাও থাক্‌বে না তার ক্ষত. কোথাও বাজ্‌বে না তার ক্ষতি, আর যতকিছু দুঃখ পেতে হবে তাদেব যাদের অপরাধ কত সামান্য!

মৃদুকণ্ঠে তপতী বলিল, অন্যদের অপরাধও কম নয়, ডাঃ রায়।

জোরগলায় অসীম বলিল, এই রকম কথা ব'লেই তোমরা মেয়েরা পৃথিবীর কাপুরুষদের প্রশ্রয় দিয়ে থাক, তপতী! যতদিন আমি তোমাকে জান্‌তাম না আমি তোমাকে ফেলেছিলাম সুবিনয়ের পর্যায়ে, কিন্তু এখন, তোমাকে কাছে দেখে এবং জেনে, একথা আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই যে সুবিনয়ের এবং তোমার অপরাধ সমান ওজনের।

—আপনি আমাকে অত্যন্ত বেশি স্নেহ করেন ব'লেই এতটা পক্ষপাতিত্ব কর্‌ছেন, ডাঃ রায়।

—হবে।. .অসীম হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

বেশ খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অবশেষে অসীমই মৌনভঙ্গ করিল।

—তোমার কথাই মেনে নিলাম. তপতী। সুবিনয়কে আমি কিছু বল্‌ব না।...এখন আমার একমাত্র ভরসা যে সে আর এদিকে পা' মাড়াবে না।...যদি সে আর একবারটিও তোমার কাছে মায়াকান্না গাইতে আসে, আমার ধৈর্য থাক্‌বে না।

বলিতে বলিতে অসীমের মুখখানা অস্বাভাবিকরূপে কঠোর হইয়া

উঠিল। অসীমের এই মূর্তি তপতী ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

*

* *

ইহারও মাসখানেক পরের কথা। তপতীর জন্য অসীম তাহার পূর্ব-পরিচিত বিশ্বাসী একজন নার্সের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। নার্সকে তপতীর ইতিহাস সে সংক্ষেপে খুলিয়া বলিয়াছিল, শুধু সন্তানের পিতাকে তাহা সে জানায় নাই। নার্সকে সে এই লোভও দেখাইয়া রাখিয়াছিল যে যদি সুস্থভাবে সন্তান প্রসব হয় তবে অসীম তাহাকে বেশ মোটা রকমের পারিশ্রমিক দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। নার্সও তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল যে ডাক্তার রায়ের কেস্‌-এর প্রতি সে সর্বদাই অতিরিক্ত যত্নবতী হইয়া থাকে।

চেম্বারের কাজে সেদিন কিছুতেই অসীমের মন বসিতেছিল না। তপতীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দিন যতই অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল অসীমের মন তপতীর প্রতি নূতন স্নেহে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। তপতীর নীরব নির্ভর, সুবিনয়ের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি তাহার অভিযোগের অভাব, সর্বোপরি তাহার অনুভূতি যে সে প্রতারিত হইয়া থাকিতে পারে,—কিন্তু বিবেকের সম্মুখে সে কোন অপরাধ করে নাই, অসীমকে দিন দিন বিস্ময়াবিষ্ট এবং মুগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল।

আজ সে কেবলই ভাবিতেছিল তাহার নিজের এই বিস্ময়াবেশ, এই মোহের কথা। অবশেষে তাহার স্নেহও কি রূপান্তরিত হইতে চলিল ভালবাসায়? কিন্তু কি অশ্রুতপূর্ব এই ভালবাসা! সে জানে তপতী ভালবাসিয়াছিল অন্যকে, নিজের দেহদান করিয়াছে অন্যকে এবং সন্তান বহন করিতেছে সেই অন্যজনের। তাহা ছাড়া তপতী এমন কিছু পরমা-সুন্দরীও নহে। এই যাহার ঐতিহ্য, তাহার সহিত কোন সুস্থমনা প্রকৃতিস্থ

যুবক ভালবাসায় পড়িতে পারে কি? যাহাকে সে ভালবাসা বলিয়া সন্দেহ করিতেছে প্রকৃতপক্ষে তাহা নিছক করুণা, স্নেহ ছাড়া আর কি হইতে পারে?

স্বভাবতঃ শান্ত ধীরচিত্ত অসীম কেমন যেন চঞ্চল হইয়া পড়িল। অবুঝ ইচ্ছার অত্যুক্তি তাহার এই স্নেহমিশ্রিত ভালবাসাকে সে নানাভাবে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিল। দেখিল, তাহার এই কামনার মধ্যে সার্থকতার আভাষ এতটুকু নাই—শুধু বেদনার নানা রঙীন্ ছায়ায় তাহার অন্তর রূপায়িত। আর সেই অন্তরের চঞ্চল লীলা তাহার কাছে অস্পষ্ট, তাহার প্রসার অনতিক্রমনীয়। সে আরও দেখিল, তাহার মনের এই বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে পুঞ্জিত রহিয়াছে ভীরুর লজ্জা, প্রচ্ছন্ন আত্মাভিমান, ছদ্মবেশের আর ... উপকরণ।

লজ্জা আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিল যখন তাহার খেয়াল হইল যে তপতী যদি তাহার মনের এই বিচিত্র লীলার এতটুকু আভাষ পায় তবে তাহার সমস্ত শ্রদ্ধা এক নিমিষে উবিয়া যাইবে।.. না, না, এই প্রকার মানসিক বিলাসে গা ঢালিয়া দিলে চলিবে না। অপ্রকাশের পর্দা তাহাকে টানিয়া রাখিতেই হইবে, তাহাকে আড়াল করিতেই হইবে ভালবাসার এই অসমাপ্ত প্রকাশকে।

হঠাৎ চেম্বারের টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল। দিবাস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া অসীম রিসিভারটা ধরিল।

—কে?

—আপনি, ডাঃ রায়?

—হ্যাঁ।

—আমি নার্স কথা বল্ছি, স্টেশনের টেলিফোন্ বাক্স থেকে। ওঁর অবস্থা বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না, আপনি চলে আসুন।

—বেদনা আরম্ভ হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—আমি এখ্খুনি আস্ছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে।

তপতীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়াছে, এখন আর স্বপ্নের রাজ্যে

বিচরণ করিবার সময় নাই। যন্ত্রপাতি প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি গুছাইয়া নিয়া অসীম ছুটিল কলিকাতার বাহিরে।

সন্ধ্যারও পরে, ডাক্তার এবং নার্সকে অনেকখানি উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়া, তপতী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। অসীম লক্ষ্য করিল, নবজাত শিশুর মুখচোখ, এমন কি কাণের পিঠে ছোট্ট একটি তিল পর্যন্ত, ঠিক সুবিনয়ের মত। নিজেরই অজ্ঞাতে তাহার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল : সুবিনয়ের ছায়া তপতীকে আজীবন অনুসরণ করিবে ইহাই কি তপতীর বিধিলিপি?

একটু সুস্থ বোধ করিয়াই তপতী খুঁজিল তাহার সন্তানকে। সুবিনয়ের সঙ্গে তাহার অদ্ভুত সাদৃশ্য সে লক্ষ্য করিল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু সন্তানকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অসীম তপতীকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। বলিল, কাঁদ্ছ কেন, তপতী? কেমন সুন্দর ফুট্‌ফুটে খোকা হয়েছে দেখ ত?

নার্স একটু আড়ালে চলিয়া গেলে তপতী বলিল, আপনি ত জানেন, ডাঃ রায়, কেন আমার কান্না পাচ্ছে। আমার এই সুন্দর খোকা—পৃথিবীর সামনে এর পরিচয় দেব কার নামে? কোন্ গৌরবে সে বড় হ'য়ে উঠবে?

—সে কথা পরে ভাবা যাবে, তপতী, এখন তুমি শান্ত হ'য়ে শোও দেখি।..বেশ যেন একটু কটুকণ্ঠেই অসীম বলিল।

তপতী অশ্রুসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল।

ধমক দিয়া তপতীর অশ্রু অসীম বন্ধ করিল সত্য, কিন্তু কথাগুলি কেবলই তাহার কাণে বাজিতে লাগিল। সত্যই ত তপতীর জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যাই যে সুরু হইল এতদিনে! তাহার সন্তানকে এখন চলিতে হইবে একাকী, আপনার রহস্যে সঙ্কুচিত হইয়া। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে এই চলা যে কত কঠিন, কত অসম্ভব হইয়া উঠিবে তাহা অসীম দেখিতে পাইতেছিল দিব্যচক্ষে। অথচ মুক্তির কোন পথই যে আর খোলা নাই!

মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল। সুস্থ সন্তান প্রসব করাইবার কৃতকার্যতার জন্য আনন্দ হওয়া ত দূরের কথা, মাঝে মাঝে অসীমের মনে হইতে লাগিল, মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই বোধ হয় সবচেয়ে ভাল হইত। যে সামান্য দুঃখ তপতী পাইত তাহা ভুলিয়া যাইতে বিশেষ দেরি হইত না।

কিন্তু ভগবান সহজভাবে কোন সমস্যার সমাধান করিবেন না বলিয়াই কি তপতীর সন্তান আজ এমন সুস্থশরীরে মাটির বুকে নামিয়া আসিল?

তাহার চিন্তাধারায় ব্যাঘাত পড়িল নার্সের আহ্বানে।

—উনি আপনাকে ডাকছেন।

অসীম উঠিল। শয়নকক্ষে যাইয়া দেখিল তপতী অনেকখানি শান্ত হইয়াছে। বেশ হাসিমুখেই তপতী বলিল, আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি, ডাঃ রায়.

—ধন্যবাদ? কেন?

—আমার সব দুঃখদুশ্চিন্তার মধ্যেও শান্তি পাচ্ছি খোকাকে বুকে নিয়ে। আপনি না থাকলে খোকাকে আজ আমার কোলে পেতাম কি?

—ওঃ, এই? এর মধ্যে ডাক্তারদের হাত খুবই সামান্য, তপতী। যারা গরীব দুঃস্থ তারা কি আর ডাক্তার ডাকতে পারে? তবু ত তাদের মধ্যে মায়ের কোলে প্রতিনিয়ত খোকারা আসছে, সুস্থ সবল দেহে!

—ডাক্তার হিসেবে আপনার কৃতিত্বের কথা বলছি না, ডাঃ রায়। আপনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমার সবচেয়ে বিপদের মুহূর্তে—বন্ধুরূপে। আপনার ঋণ আমি কোন দিন পরিশোধ করতে পারব না।

—পরিশোধ করার চেষ্টাও ক'রো না তাহ'লে।...পরিহাসের সুরে তরলকণ্ঠে অসীম বলিল।

—ঠাট্টার কথা নয়, ডাঃ রায়। আমি জানি নিজের প্রশংসা শুনতে আপনি ভালবাসেন না, কাজেই প্রশংসার কোন কথাই আমি বলব না। কিন্তু এটা আমাকে বলতেই হবে যে আপনি সাধারণ মানুষের অনেক ওপরে—যখন আমার সন্তানের পিতা আমাকে ত্যাগ ক'রে চলে গেল আপনি অকুণ্ঠিতভাবে এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে।

তপতীর এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধানিবেদন অসীমের মনের গভীরতম প্রদেশ

স্পর্শ করিল। সে তপতীর চুলের উপর নিজের হাতখানি রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সেজন্য মুখে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কোন প্রয়োজন নেই, তপতী।... তোমার মনের ধন্যবাদ আমি অনেক আগেই গ্রহণ করেছি, এখন তুমি চুপ ক'রে ঘুমোও দেখি।

অসীমের সবল হাতখানি নিজের দুর্বল মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিয়া তপতী শান্ত নির্ভরে ঘুমাইয়া পড়িল।

আরও সাতদিন পরের কথা। অসীমের সুচিকিৎসা এবং নার্সের পরিচর্যার ফলেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, তপতী ইহার মধ্যেই অনেকখানি সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল।

নির্নিমেষনেত্রে তপতী তাহার সন্তানের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছিল। তাহার খোকা, তাহার শরীরের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিযা তৈযারী তাহার সন্তান! ইহাব মধ্যে সুবিনয়ের যে খানিকটা অংশ আছে তাহা একবারও তাহার মনে হইতেছিল না। খোকা একমাত্র তাহারই!

সম্মুখেই শীত আসিয়া পড়িতেছে। খোকার জন্য তপতী পশমের একজোড়া মোজা বুনিতেছিল এবং তাহার মন চলিয়া গিয়াছিল অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। খোকা বড় হইবে, তাহাকে সে মানুষ করিয়া তুলিবে তাহার নিজের আদর্শে, বড় হইয়া খোকা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে তাহার বাবার কথা তখন সে শুধু বলিবে, তিনি বেঁচে নেই, খোকন্!... তাহার পর খোকা স্কুলে যাইবে, কলেজে পড়িবে, একদিন কোন মেয়েকে ভালবাসিবে, বিবাহ করিবে আর সে, খোকার গর্বিতা জননী, খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিবে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবে, আমার খোকা বেঁচে থাকুক, বড় হোক্!

দোল্নায় শায়িত খোকা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি

ছুটিয়া তপতী গেল তাহার কাছে। বিছানা ভিজাইয়া দিয়া সে অস্বস্তি বোধ করিতেছে!

বিছানা বদ্‌লাইয়া দিতেই খোকার মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার নিজস্ব ভাষায় এবং ভঙ্গীতে সে জানাইল তাহার কৃতজ্ঞতা। গভীর স্নেহে তপতী তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতে লাগিল—খোকা আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

তপতী আবার ভাবিতে লাগিল—এবার দিবাস্বপ্ন নয়, রূঢ় বাস্তবের কথা। অসীমের স্কন্ধে চিরদিন ভর করিয়া থাকা তাহার চলিবে না, তাহাকে আবার কাজ খুঁজিতে হইবে। যে স্কুলে সে এতদিন ছিল সেখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ, কারণ অবিবাহিতা সন্তানের জননীকে স্কুলের কর্তৃপক্ষ কিছুতেই স্থান দিবেন না। তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে অনেক দূরে—হয়ত বাংলাদেশের বাহিরে—যেখানে তাহার পূর্ব ইতিহাস কেহ জানে না, যেখানে তাহার বৈধব্যের কাহিনী কেহ অবিশ্বাস করিবে না।

নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর সে এখনও হারায় নাই। তাহা ছাড়া খোকাকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে যে! খোকার হাসি, খোকার আব্‌দার তাহাকে দিবে শক্তি, তাহাকে জোগাইবে প্রেরণা।

একটু পরেই অসীম ফিরিল। তপতীর বিস্ময়বিমুগ্ধ মুখখানার দিকে তাকাইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিল, খোকার স্বপ্নে ডুবে আছ দেখি

—দেখুন না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেমন হাস্‌ছে!...আচ্ছা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওরা স্বপ্ন দেখ্‌তে পায় নাকি?

—না, এই বয়সে নয়।...হাসিয়া অসীম জবাব দিল।

অসীমের এই উত্তর তপতীর মনঃপূত হইল না। সে মুখখানা কালো করিয়া বলিল, আপনি কিচ্ছু জানেন না, ডাঃ রায়।...নিশ্চয়ই খোকা স্বপ্ন দেখ্‌ছে—দেখুন না, এই একটু আগে কেমন হাস্‌ছিল, এখ্‌খুনই আবার কেমন কাঁদো কাঁদো হ'য়ে গেল!

—স্বপ্ন ওরা দেখে না, তপতী। স্বপ্ন দেখে ওদের মা'রা!

কথাটা ঘুরাইয়া নিয়া তপতী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা আপনি ত খোকাকে

সাতদিন ধ'রে দেখ্‌ছেন, বেশ সুস্থ আছে, না? আর ওর ওজন ঠিক যা' হওয়া উচিত তাই আছে ত? পরশুদিন নার্স যখন ওর ওজন নিল, আপনি যেন কি একটা মন্তব্য কর্‌লেন—আমি শুন্‌তে পেলাম না!

উদ্বিগ্ন চোখে তপতী অসীমের দিকে তাকাইল।

—তোমার খোকা সম্পর্কে এখন থেকেই যা' ভাব্‌তে সুরু করেছ, এর পর ত ভাবনার পাহাড় তোমার ঘাড়ে এসে পড়্‌বে।..খোকার ওজন ঠিক আছে—যা' হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি বই কম নয়।

তপতী আশ্বস্ত হইল। একটু হাসিয়া বলিল, বুঝতেই ত পার্‌ছেন, মায়ের প্রাণ, সব সময় শঙ্কা জাগে।

অসীম বলিল, আজ সুবিনয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। খবরটা তাকে দিয়েছি। খুসীই হয়েছে ব'লে মনে হল। ওর ভয়ানক ইচ্ছা একবার এসে তোমাদের দেখে যায়। আমি হ্যাঁ না কিছুই বলিনি'—শুধু বলেছি, তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রে তাকে জানাব।

তাড়াতাড়ি তপতী বলিয়া উঠিল, না, না, সুবিনয়কে এখন এখানে কিছুতেই ডাক্‌বেন না, ডাঃ রায়। খোকা আর একটু বড় হোক্‌, তখন দেখা যাবে।

—সুবিনয়ের অবশ্য এখনই আস্‌বার সময় নেই, কারণ সে অত্যন্ত ব্যস্ত, তার স্ত্রীরও বেদনা সুরু হয়েছে—আমাকে একটু পরেই সেখানে যেতে হ'বে!

অকারণ একটা আশঙ্কায় তপতীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। নিজেরই অজ্ঞাতে তাহার হাতটা গিয়া পড়িল দোল্‌নায় তাহার খোকার পিঠের উপরে—যেখানে সে ঘুমাইতেছিল।

—আজ হয়ত আমার ফির্‌তে দেরি হবে, আর যদি প্রয়োজন হয় তাহ'লে রাতটা কল্‌কাতায়ই কাটাব। তুমি চিন্তা ক'রো না, তপতী। নার্সকেও আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার ত তাকে তেমন কোন প্রয়োজন নেই।...অনেক চেষ্টা ক'রেও আর কোন নার্সকে পেলাম না। তুমি একা থাক্‌বে, ভয় পাবে না ত?

—না, খোকা রয়েছে, আমার আবার ভয় কিসের?...সাহসের সহিত

তপতী বলিল. কিন্তু আবার তাহার বুকটা কেমন দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

অসীম আধঘণ্টা পরেই নার্সকে সঙ্গে নিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। আর তপতী অলস অপরাহ্ণে নিয়া বসিল তাহার ঘটনা-বৈচিত্র্য-বহুল জীবনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতাগুলি।

সত্যই কি সে সুবিনয়কে ভালবাসিয়াছিল? যে ভালবাসা কয়েক মাসের মধ্যে এমন নিঃশেষ হইয়া ধুইয়া-মুছিয়া যায় তাহাকে অন্তরের অনুভূতির কোন পর্যায়ে ফেলা উচিত? সুবিনয়ের কথা মনে করিতে তাহার বুক ত আর বেদনায় আতুর হইয়া উঠে না. সুবিনয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দিনগুলির স্মৃতি আর ত তাহাকে উদ্বেল করিয়া তোলে না! খোকা কোলে আসিবার পূর্বেও সে হয়ত মাঝে মাঝে অনুভব করিত হাওয়া ছড়ানো একটা স্পর্শ, সুবিনয়ের শরীরের একটা অস্পষ্ট গন্ধ (যদিও সেই অনুভূতির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ছিল না এতটুকু). কিন্তু এখন সুবিনয় যেন সত্যসত্যই তাহার কাছে মৃত. অবলুপ্ত!

কেন এমন হইল? সুবিনয়ের প্রতি তাহার ভালবাসা কি শুধু ভালবাসার জন্য আকাঙ্ক্ষা মাত্র ছিল? অর্থাৎ তাহার মধ্যে প্রাণের সংযোগ ছিল অতি সামান্যই. তাহা ছিল প্রধানতঃ যৌবনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ মাত্র?

প্রশ্নের কোন সদুত্তরই তপতী খুঁজিয়া পাইল না। অনাবিষ্কারের রাজ্য হইতে চলিয়া আসিয়া সে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিল তাহার নবলব্ধ ধন. তাহার খোকাকে।

অসীম যাহা ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল। মৃত্যুর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া সে রেবাকে বাঁচাইয়া তুলিল বটে, কিন্তু রেবার সন্তানকে সে রক্ষা করিতে পারিল না। হতবুদ্ধি সুবিনয় শুনিল রেবা একটি মৃতপুত্র

প্রসব করিয়াছে এবং যদিও রেবার প্রাণ আপাততঃ বিপদের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া আসিয়াছে, তবু আশঙ্কার কারণ একেবারে চলিয়া যায় নাই।

অসীম বলিল, তোর স্ত্রীর জ্ঞান হ'তে বেশ দেরি হবে, সুবিনয়। আমার বোধ হয় আজ এখানেই শুয়ে থাকা উচিত হবে।

—তুমি যা' ভাল বোঝ, অসীম।...সুবিনয় বলিল।

তাহার পর উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, রেবা কি জানে তার মৃত-সন্তান হয়েছে?

—না, কারণ প্রসব হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই সে জ্ঞান হারিয়েছে।...অবশ্য আজ না হোক্, কাল ত তাকে জানাতেই হ'বে।

সুবিনয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাবিহীন জীবন-যাত্রা তাহার কপালে নাই, নহিলে রেবা মৃতসন্তান প্রসব করিবে কেন? তপতী ও ত তাহারই সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, ভগবান তাহার কোলে কেমন সুস্থ সবল সন্তান আনিয়া দিলেন! আর এই একই ডাক্তার এবং নার্স ত দুই প্রসূতিরই প্রসবকার্যে সহায়তা করিয়াছে।

অসীম বলিল, তুই আর জেগে থেকে কি কর্‌বি, তুই ঘুমো। আমি তোর স্ত্রীর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ঘুমুতে পারব না—আমাকে জেগে থাক্‌তেই হবে।

বলিয়া সে আবার প্রসূতির ঘরে ছুটিয়া গেল।

নার্স অসীমকে ইঙ্গিতে জানাইল যে মনে হইতেছে রেবার শীঘ্রই জ্ঞান হইবে।

সত্য সত্যই একটু পরে রেবা চেতনাশক্তি খানিকটা ফিরিয়া পাইল। বিহ্বল নেত্রে অসীমের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েছে?

অসীম একবার নার্সের দিকে তাকাইল, তাহার পর বলিল, খোকা।

—আঃ, বাঁচলাম। উনি খোকাই চেয়েছিলেন।..বলিয়া সে আবার চক্ষু মুদিল।

অসীম রেবার কাণের কাছে মুখটা নিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আপনি এখন ভাব্‌বেন না। খোকাকে নার্স পাশের ঘরে নিয়ে গেছে-- আপনি চুপটি ক'রে ঘুমোন দেখি'।

খোকাকে কোলে করিবার বা তাহাকে দেখিবার শক্তি রেবার সত্য-সত্যই লোপ পাইয়াছিল। সে কোন প্রতিবাদ না করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে চেষ্টা করিল।

অসীম রেবার নাড়ী এবং বুক আবার পরীক্ষা করিয়া একটা ইন্‌জেক্‌শন্‌ দিয়া চিন্তিতমুখে সুবিনয়ের ড্রয়িং রুমে আসিয়া দাঁড়াইল।

উদ্বিগ্নভাবে সুবিনয় প্রশ্ন করিল, কি খবর অসীম?

—তোর স্ত্রী ভালই আছে, তবে হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আমার কেবলই ভয় হচ্ছে মৃতসন্তানের কথা শুনে না হার্ট ফেল্‌ হয়। বড় খুসী হয়েছে যখন আমি বল্‌লাম খোকা হয়েছে, এবং পাশের ঘরে আছে।

সুবিনয় কিছুক্ষণ বোকার মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তপতীকে সে হারাইয়াছে, চিরদিনের মত। আর আজ রেবাও তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে! দুই দুইটি সন্তানের পিতা হইয়াও তাহাকে বাবা বলিয়া কেহ ডাকিবে না! তাহার মনে পড়িল ব্রজমোহনবাবুর শেষ কথাগুলি, বৌমার শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি রাখিস্‌ সুবিনয়, আমাদের বংশের বাতি বহন করছে সে, তার যেন অযত্ন না হয়!

এলোমেলো অনেক কথাই সুবিনয়ের মনে হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই সে বলিতে পারিল না।

অসীম প্রশ্ন করিল, কি ভাব্‌ছিস্‌, সুবিনয়? মনে হচ্ছে কি একটা কথা বল্‌তে চাস্‌, ব'লে ফেল্‌!

মরিয়া হইয়া সুবিনয় বলিয়া উঠিল, রেবাকে বাঁচাবার একটা মাত্র পথ আছে, অসীম।

—কি?...বিস্মিতভাবে অসীম প্রশ্ন করিল।

—তপতীর ছেলেকে যদি তুমি আজই রাত্রে এখানে নিয়ে এসো। রেবা কিছুই জান্‌বে না, আর এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাক্‌বে শুধু তুমি আর তোমার নার্স। তুমি আমার বন্ধু, তোমাকে আমি অকুণ্ঠিতভাবে বিশ্বাস কর্‌তে পারি, আর নার্সের মুখ বন্ধ কর্‌বার জন্য আমি সে-যা-চায় দিতে রাজী আছি।

প্রস্তাবটার নৃশংসতায় অসীম স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল শুধু একটি কথা, তুই, সুবিনয় বল্‌ছিস্‌ তপতীর কোল থেকে তার ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে আন্‌তে!

—ছিনিয়ে নিয়ে আসার কথা বল্‌ছি না, অসীম। তপতীর সম্পূর্ণ সম্মতি নিয়েই আন্‌বার কথা বল্‌ছি। তুমিই ত সেদিন বল্‌ছিলে তপতীর এখন সব চেয়ে বড় সমস্যা হয়েছে কি পরিচয়ে তার ছেলেকে পৃথিবীর সম্মুখে তুলে ধর্‌বে, কার নাম বহন ক'রে তার ছেলে বড় হ'য়ে উঠ্‌বে। তার ছেলে যদি আজ রেবার মৃতপুত্রের স্থান অধিকার করে তাহ'লে এই সমস্যার অত্যন্ত সহজ, সুষ্ঠু একটা সমাধান হ'য়ে যায় না কি? হাজার হোক্‌, আমি ত তপতীর সন্তানেরও বাবা, আমার কাছে তার অনাদর হবে না এতটুকু। আর রেবা কিছুই জান্‌বে না, সে আনন্দে সগৌরবে মানুষ ক'রে তুল্‌বে তপতীর ছেলেকে নিজের প্রসূত সন্তান ভেবে।

অসীম চুপ করিয়া রহিল। সুবিনয়ের প্রস্তাবটা কঠোর হইলেও তাহার মধ্যে যুক্তি যে আছে অনেকখানি তাহা সে না মানিযা পারিল না। আজ বোধ হয় এই প্রথম সে স্বীকার করিল যে সুবিনয়েরও খানিকটা বুদ্ধি আছে।

সুবিনয় বলিয়া চলিল আমার প্রতি বিরূপ হ'য়ে তুমি আমার প্রস্তাবটা অসম্ভব ব'লে উড়িয়ে দিও না, অসীম।...রেবার প্রাণ এবং তপতীর ছেলের ভবিষ্যৎ এখন সম্পূর্ণ তোমার হাতে, শান্তভাবে একটু ভেবে দেখো।

অসীমের একবার মনে হইল সে চীৎকার করিয়া বলে, অসম্ভব; তপতীকে এমন দুঃখ আমি দিতে পার্‌ব না কিছুতেই। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল পাশের ঘরে মৃত্যুপথযাত্রী রেবার কথা। রেবা ত কোন অপরাধ করে নাই, সে ডাক্তার হইয়া তাহার আরোগ্যের উপায় জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে ঠেলিয়া দিবে মৃত্যুর দুয়ারে?

আর তপতী? তপতী দুঃখ পাইবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যতদূর সে তপতীকে জানে, সে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। তাহার সন্তান সুবিনয়ের গৃহে সুবিনয়ের পুত্রভাবে স্থান পাইলে ভবিষ্যতের সমস্ত সমস্যাই যে সমাধান হইয়া যাইবে, তাহা তপতী নিশ্চয়ই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আশু

দুঃখ পাইলেও ভবিষ্যতে সে হয়ত কৃতজ্ঞতা জানাইবে তাহাকেই, তাহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টির জন্য।

সুবিনয় তখনও বলিয়া চলিতেছে, তপতী যাতে নিয়মিতভাবে তার ছেলেকে দেখতে পায় সে ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় কর্‌ব অসীম। এখন তুমি আর দেরি না ক'রে তপতীর কাছে চলে যাও, তাকে বুঝিয়ে ব'লো সব কথা। তুমি বল্‌লে সে আপত্তি কর্‌বে না।

—নিজের উপর এতখানি বিশ্বাস আমার নেই সুবিনয়। তবে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি। কিন্তু তুইও আমার সঙ্গে আয় না, এখান থেকে ত মাত্র আধঘণ্টার পথ।

—না, না, আমি যাব না। আমি তোর সঙ্গে গেলে হিতে বিপরীত হবে।

অসীম আর পীড়াপীড়ি করিল না। নার্সকে ডাকিয়া বলিল যে সে দুইএক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিবে, ইহার মধ্যে রেবার অবস্থার কোন পরিবর্তন সে আশা করে না, তবে নিতান্তই যদি তাহার নাড়ী অত্যন্ত দুর্বল বলিয়া মনে হয় আধঘণ্টা পরে সে রেবাকে যেন একটা ইন্‌জেক্‌শন্‌ দেয়।

রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। সারাটা রাত্রি তপতীর কাটিয়াছে নানা দুঃস্বপ্নে। সে জাগিয়া উঠিয়াই তাহার খোকার সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

উস্কখুস্ক চুল নিয়া বিবর্ণমুখে অসীম বাড়িতে প্রবেশ করিল। তপতীকে ডাকিয়া বলিল, তপতী, জেগে আছ?

—হ্যাঁ, ডাঃ রায়, আসুন।

অসীম তপতীর ঘরে ঢুকিল।

—কি খবর?...তপতী প্রশ্ন করিল।

—একটি ছেলে হয়েছিল, ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।

—আহা, বেচারী'.. সহানুভূতিতে তপতীর হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া উঠিল।...আর তার মায়ের খবর কি?

—মায়ের অবস্থাও অত্যন্ত সংকটাপন্ন। মা জানে না যে মৃতছেলে হয়েছে। সে শান্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে এই আশায় যে একটু পরেই ছেলেকে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু তার হার্ট এত দুর্বল যে আসল খবরটা পেলে শক্ বোধ হয় সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।

ভীত চক্ষে তপতী অসীমের দিকে তাকাইল। তাহাকে এসব কথা বলার অর্থ কি? রোগিনীর অবস্থা যেখানে এত সংকটাপন্ন সেখানে তাহার শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া ডাক্তার তাহার কাছে আসিয়াছে কেন?

অসীম বলিল, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ কর্‌তে এলাম, তপতী। আমার মনে হচ্ছে রেবার জীবন বাঁচাবার উপায় আছে মাত্র একটা—যদি তোমার ছেলেকে সেখানে দিয়ে আস্‌তে পারি।...ওকি, তুমি কাঁপ্‌ছ কেন?

নিজেকে সংযত করিয়া তপতী বলিল, না, কাঁপছি না, আপনি ব'লে ফেলুন আপনার বক্তব্য।

—আরেকটা কথা তুমি ভেবে দেখো। সেটা হচ্ছে তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ। তুমি ত অবুঝ নও, তুমি জান পৃথিবীর যা' আইন-কানুন, আদব-কায়দা তাতে তোমার ছেলে তোমার কাছে থেকে কিছুতেই প্রকৃতিস্থ-ভাবে মানুষ হ'য়ে উঠতে পারবে না। বড় হ'য়ে সে যখন তোমাকে তার বাবার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বে তখন কি জবাব দিবে তুমি? বাইরের লোকের কাছে তুমি বল্‌তে পার তুমি স্বামীহীনা, বিধবা, তারা হয়ত তোমার স্বামীর কুলপরিচয় জান্‌তেও চাইবে না। কিন্তু তোমার ছেলেকে—এবং সে তোমারই মত বুদ্ধিমান্ হবে এই আশা আমরা রাখি—ত তুমি সন্তোষজনক কোন জবাবই দিতে পারবে না! আর যখন সে জানবে যৌবনের স্রোতে একদিন তার মা নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, এবং তারই ফলে হয়েছে তার জন্ম, তখন তোমার প্রতি তার মনোভাব কি শ্রদ্ধাজনক হবে, তপতী? আজীবন সে কি তোমাকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখবে না—মানসিক বৈষম্যে তার সমস্ত সত্ত্বা কি ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠবে না?

তপতী অসীমের এই সমস্ত যুক্তি শুনিল কি না বোঝা গেল না, দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে শুধু বলিল, এই প্রস্তাবটা আপনার মাথা থেকে কিছুতেই আসেনি', ডাঃ রায়। এ হচ্ছে সুবিনয়ের প্রস্তাব।

অতর্কিত এই আঘাতে অসীম প্রথমে চম্‌কাইয়া উঠিল। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সাম্‌লাইয়া নিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা সে বলিল।

—ঐখানেই তুমি আবার ভুল কর্‌ছ, তপতী। প্রস্তাব সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। সুবিনয় বরং এতে রাজী হয়নি'...সে বল্‌ছিল তোমার প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হবে।

শ্লেষের সহিত তপতী বলিল, ধন্যবাদ। আর আপনার বুঝি সম্পূর্ণ উল্টো মত? আপনার বিচারের মাপকাঠিতে বুঝি এতে আমার প্রতি কোন অবিচার করা হবে না?

গভীর সুরে অসীম বলিল, তোমার প্রতি যে কত বড় অবিচার করা হবে তা' আমার চেয়ে নিবিড়ভাবে কেউ অনুভব করে না তপতী।...কিন্তু এখন ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আলোচনা করবার সময় নেই যে, তোমার সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তুমি মন স্থির ক'রে ফেলো।

অসীমের শেষের কথা কয়টির মধ্যে অনুনয়ের একটা করুণসুর বাজিয়া উঠিল।

তপতী আর থাকিতে পারিল না। ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কেন আপনারা সবাই আমার বিরুদ্ধে এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ফেঁদেছেন, ডাঃ রায়? আমি ত আপনাদের কোন ক্ষতিই করিনি', পৃথিবীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ, কোন দাবীই ত আমি তুলিনি', তবু আপনারা কেন আমার শেষ সম্বল, শেষ সুখটুকুকে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছেন?

বলিয়া সে পার্শ্বস্থিত খোকাকে অত্যন্ত জোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। অস্বাভাবিক এই বলপ্রয়োগে শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

অসীম বলিল, আর খুব বেশি সময় নেই, তপতী। আমার প্রস্তাব যদি কাজে পরিণত করতে হয় তাহ'লে তা' শেষ কর্‌তে হবে রেবার ঘুম ভাঙ্গ্‌বার আগে।...তুমি অমত ক'রো না।...আমি ব্যবস্থা কর্‌ব তোমার খোকাকে যাতে তুমি মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাও।

—আপনারা কি আমাকে ভাব্‌বার এতটুকু সময় পর্যন্ত দেবেন না, ডাঃ রায়?

অসীম নীরবে দাঁড়াইল রহিল।

তপতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বুকের কাছে অর্ধশায়িত খোকার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর অতি মৃদুস্বরে, যেন অশ্রুত-বাণী শুনিতেছে এই ভাবে, বলিল, তাই হোক্।...নিজের স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে আমার সোণার খোকার জীবনটা আমি নষ্ট হ'তে দেব না।...যেখানে আমার খোকার যথার্থ স্থান সেখানেই সে বেড়ে উঠুক নিজের গৌরবে। দূর থেকে আমি শুনব আমার খোকার কথা—সে বড় হয়েছে, সে সমাজের বুকে মাথা উঁচু ক'রে চলেছে। কেন তার জীবন কলঙ্কিত হবে তার হতভাগিনী মায়ের পরিচয়ের সংস্পর্শে?

শ্রাবণ মেঘের মত গম্ভীর মুখখানা তুলিয়া তপতী প্রশ্ন করিল, খোকাকে কি আপনিই নিয়ে যাবেন, ডাঃ রায়?

অপরাধীর মত অসীম জবাব দিল, হ্যাঁ। আমি একাই এসেছি।

—একটু দাঁড়ান, খোকার জামাটা আমি বদ্‌লে দিচ্ছি।...আর এই মোজা জোড়া আমি সেদিন বুনেছি, খোকার নতুন মাকে যা'হয় একটা কিছু ব'লে দেবেন, যাতে আমার খোকা তার পুরানো মায়ের অতি সাধারণ এই স্নেহের দান অন্ততঃ কয়েকটা দিন ব্যবহার করতে পারে।

ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়া অসীম তাহার কোলে তুলিয়া নিল তপতীর সন্তানকে। আর তপতী ডাঃ রায়ের গাড়ির কাছে যাইয়া অতি যত্নে রচনা করিয়া দিল খোকার জন্য শয্যা। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সে তাহার খোকার কপালে একটি চুম্বন মুদ্রণ করিয়া অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাহাকে করিল আশীর্বাদ।

অসীম বলিল, আমি বিকেলের মধ্যেই ফির্‌ব তপতী।...বলিয়া সে গাড়িতে স্টার্ট দিয়া সবেগে কলিকাতায় ছুটিল।

যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় তপতী অসীমের গাড়িটার দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর ঘরে ছুটিয়া আসিয়া খোকার খালি দোল্‌নাটার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সে অঝোরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

*
* *

দেড় মাস পরের কথা। ছোট্ট সহর রতনপুরে আমাদের পরিচিত একটি বাড়িতে স্তিমিত আলোকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী কথা বলিতেছে।

পুরুষটি বলিতেছিল, মনের উপর জোর করা চলে না, তপতী, কাজেই আমি কখনও এমন দাবী করছি না যে তুমি আমাকে ভালবাস। আমি শুধু বলছি এই যে, তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রো যখন আমি বলি আমি তোমাকে ভালবাসি। আমার এই ভালবাসা গড়ে উঠেছে অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে। যেদিন থেকে তোমাকে দেখেছি সেদিন থেকেই আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে তোমার প্রতি উচ্ছলিত হ'য়ে উঠেছে আমার শ্রদ্ধা, আমার সহানুভূতি, আমার স্নেহ। তারপর তোমাকে দেখেছি সুবিনয়ের প্রিয়ারূপে, সুবিনয়ের সন্তানের গর্ভধারিণীর মূর্তিতে, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা তাতে এতটুকু কমে নাই।...অন্ততঃ আমার দিকটায় তাকিয়ে তুমি আমাকে গ্রহণ কর, এই আমার মিনতি।

নারীটি ক্ষিন্নকণ্ঠে জবাব দিল, আমি তোমার শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, অসীম। তোমার সহানুভূতি এবং স্নেহ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছি, কিন্তু অসঙ্গত অনুরোধ আমায় ক'রো না।

—আমার অনুরোধটা কি একান্তই অসঙ্গত, তপতী? মনের কথা ছেড়েই দাও, তপতী। পৃথিবীতে চলতে হ'লে তোমার কি কোন বন্ধু, কোন সহায়কের প্রয়োজন হবে না কোনদিন? অন্ততঃ এই দিকটা বিবেচনা ক'রে তুমি আমাকে গ্রহণ কর।

—কেন তুমি বুঝতে পারছ না, অসীম? মানুষ ত পুরাতন আবরণের মধ্য থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বেরিয়ে আসতে হ'লে প্রয়োজন হয় দুর্দমনীয় সাহসের অথবা অশ্রুতপূর্ব হৃদয়হীনতার, যার কোনটাই আমার নেই।

—কি অবলম্বন নিয়ে তুমি তোমার জীবন কাটাবে, তপতী? তোমার জীবনের এই ত আরম্ভ—তোমাকে বাঁচতে হবে আরও অনেক দিন, মাস, বৎসর। কি করবে তুমি?

—আমার একার জীবনের জন্য আমি মোটেই ভাবি না। লেখাপড়া যা' শিখেছি তাতে নিজের অন্নসংস্থানের উপায় ক'রে নিতে পারব। আর তুমি যে সব বড় বড় কথা বলছ—মনের আনন্দ, শান্তি, জীবনের আদর্শের কথা—সে সব নিয়ে আমি এখন মাথা ঘামাচ্ছি না মোটেই। অনাগত ভবিষ্যৎকে আমরা নিজেদের খুসীমত যেভাবেই চিত্রণ করতে চেষ্টা করি না কেন, নিয়তির হস্তক্ষেপে আমাদের রচিত সব ছবিই বদ্‌লে যেতে পারে, আমাদের অভিরুচির বিরুদ্ধে। পরিকল্পনা করতে আমার আর প্রবৃত্তি নেই, অসীম।

—কিন্তু পরিকল্পনা করা যে মানুষের ধর্ম। এই বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেকটি মানুষ সৃষ্টি ক'রে তুল্‌ছে নিজের একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য, যেখানে বিচরণ করছে সে নিজে এবং তাহার অন্তরঙ্গ দুই-একটি বন্ধু বা আত্মীয়। তোমার ক্ষুদ্র রাজ্যে আমার এতটুকু স্থানও কি হবে না, তপতী?

—তুমি আমাকে বড় প্রহেলিকার মধ্যে ফেল্‌ছ, অসীম। আমার নিজের মনকে আমি নির্মমভাবে খুলে তুলে ধরেছি তোমার সম্মুখে, তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না! আমি আবার বলছি, ভালবাসবার ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেলেছি। সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে—ভালবাসার ক্ষমতারও ক্ষয় হ'তে পারে, মৃত্যু হ'তে পারে, বিশ্বাস ক'রো।

—আমি ত তোমাকে অবিশ্বাস করছি না। তুমি যা' আমি তাই চাই। তোমার কাছে বিশেষ কোন দাবী আমার নেই এবং শপথ ক'রে বল্‌ছি, দাবী কোন দিন জানাব না। আমি চাই তোমাকে রক্ষা কর্‌তে, ভবিষ্যতের বাত্যা, ঝঞ্ঝার আঘাত থেকে তোমাকে বাঁচাতে।

—কিন্তু কেন এই অনুগ্রহ, অসীম?

—তোমাকে ত আগেই বলেছি, তোমাকে আমি ভালবাসি। কল্পনার রঙীন্‌চোখে দেখা তপতীকে নয়, রক্তমাংসের মানুষ দুর্বল তপতীকে।

—এরকম ভালবাসার কোনই সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই নে!

—কারণ খুঁজবার চেষ্টা ক'রো না। শুধু বিশ্বাস ক'রো আমার ভালবাসাটা সত্য, এই নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত গভীর হ'য়ে জেগেছে আমার অন্তরে।

—কিন্তু প্রতিদানে আমার দেবার মত কিছুই যে নেই, অসীম।

—তোমাকে ত বলেছি, প্রতিদানে আমি কিছুই চাইনে। আমি শুধু চাই তোমাকে ভালবাসিতে।

—দূর থেকে কি আমাকে তুমি ভালবাসতে পার না, অসীম।

—হয়ত পারি, কিন্তু কষ্ট হয়। তা'ছাড়া আমার স্বার্থও যে আছে, একটু। যে সত্য আমি অনুভব করেছি তাকে আমি বিকশিত দেখতে চাই বাস্তবজীবনে, তোমাকে কেন্দ্র ক'রে। সত্য তার চরম অর্থ পায় জীবনের সমস্ত ঘটনার সঙ্গে পরস্পর গ্রথিত হ'য়ে। আমার অন্তরের ভালবাসা মূর্ত হ'তে চায় তোমার রক্ষক, তোমার বন্ধু হ'বার সুযোগ লাভ ক'রে। আমাকে তুমি নিরাশ ক'রো না।

একটু থামিয়া অসীম গাঢ়কণ্ঠে আবার বলিল, ব'লো, তপতী, তুমি আমাকে অধিকার দেবে? যে কারাগারে তুমি বন্দী হ'য়ে রয়েছ তা' থেকে তোমাকে মুক্ত করবার সুযোগ আমি পাব?

তর্ক করিতে করিতে তপতী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর তর্ক সে করিতে পারিবে না। কে জানে সত্য কোথায়! কে জানে মোহ অন্ধকারের জাল বুনিয়া সে নিজেই সত্যকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে কি না! অসীম হয়ত আসিয়াছে তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে!

মুহ্যমান্ তপতীর যেন কথা বলিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। গভীর শ্রান্তিতে পার্শ্বস্থিত তাকিয়াগুলির মধ্যে সে মুখ গুঁজিল।

ঠিক সেই সময়েই কলিকাতায় রাসবিহারি এভিনিউ-এর দোতলা একটি বাড়ির সম্মুখে অনেক গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সুন্দরী-সুবেশী অনেক মহিলা এবং তরুণী তাঁহাদের স্বামী, পিতা বা ভ্রাতা সমভিব্যাহারে সেখানে প্রবেশ করিতেছেন। দরজার সম্মুখে সুবিনয় অভ্যাগতদিগকে সম্বর্ধনা করিতেছে এবং ভিতরে তাহার পিতা ব্রজমোহন-বাবু অতিথিদিগকে ড্রইং রুমে আহ্বান করিয়া নিয়া যাইতেছেন। ড্রইং রুম সুসজ্জিত, চারিদিকে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, প্রত্যেক অতিথির সম্মুখে চাকর খাবারের রেকাবি এবং চায়ের পেয়ালা তুলিয়া ধরিতেছে।

সুবিনয়ের প্রথম সন্তানের জন্ম উপলক্ষে এই উৎসব। মাতৃত্বগর্বে গর্বিতা রেবা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর আয়ার কোলে খোকা অভ্যাগতদের আনন্দ এবং প্রশংসা বর্ধন করিতেছে।

—খোকার চেহারাটা লক্ষ্য করেছিস্? বাবার মুখখানা যেন কেউ কেটে বসিয়ে দিয়েছে!

—কাণের পিঠে ছোট্ট তিলটা দেখেছিস্? রেবাদি' বল্‌ছিলেন, খোকার বাবারও কাণের পিঠে ঠিক ঐ জায়গায় একটা তিল রয়েছে!

—খুব সুস্থ বেবি হয়েছে কিন্তু, মিসেস্ মিত্র! এরকম বেবি হ'তে প্রাণ সংকটাপন্ন হওয়া মোটেই কিছু আশ্চর্যের নয়!

—সব কৃতিত্ব হচ্ছে আমাদের ডাঃ রায়ের। শুনেছি, তিনি না থাক্‌লে মা ছেলে কাউকেই বাঁচানো সম্ভবপর হ'ত না।

—রেবাকে আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, না, প্রমীলা? শাড়ীটাও বেশ মানিয়েছে কিন্তু। দেখ্‌লে মনেই হয় না এই সবেমাত্র সে ছেলের মা হয়েছে!

—সুবিনয়বাবুর মুখখানা কিন্তু কেমন যেন শুক্‌নো দেখ্‌লাম, ভাই। ওঁর বাবার মুখে হাসি ধরে না—আর স্ত্রীও কেমন সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ওঁকে দেখে মনে হয় যেন আজকের উৎসবে তিনি যেন নিঃসঙ্কোচে গা ঢেলে দিতে পার্‌ছেন না।

—তোমার অন্তর্দৃষ্টির যত সব বাড়াবাড়ি। কই, আমার ত সুবিনয়বাবুকে এতটুকু অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল না। ঐ দেখ, তিনি খোকার কাছে এগিয়ে এসেছেন!...বাঃ, চুপি, চুপি খোকাকে বেশ একটি চুমুও খেয়ে গেলেন দেখি!

অন্যদিকে পুরুষদের দলে ব্রজমোহনবাবু এবং নায়েবমহাশয় গল্পগুজবে বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। আজকার এই আনন্দমুহূর্তে ব্রজমোহনবাবুর বারবারই মনে হইতেছিল তাঁহার লোকান্তরিতা গৃহিণী, সুবিনয়ের গর্ভধারিণীর কথা।

—সুবিনয়ের মা মারা যাবার পর থেকে বড় আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি সুবিনয়কে মানুষ করেছিলাম, শশধরবাবু। আজ আমার সব আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'ল!

– আপনার নাতি আপনার বংশের মান বাঁচিয়ে রাখবে।

–আপনারা আশীর্বাদ করুন, সে সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকুক।

– আপনি জানেন না কর্তাবাবু কতবছর ধরে দিন গুণছেন এই দিনটির জন্যে, যেদিন তিনি ছোটবাবুর ছেলেকে কোলে নিয়ে সকলের সামনে দাঁড়াতে পারবেন!

—এবার আপনি গ্রামের বাস উঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় চলে আসুন না, ব্রজমোহনবাবু! নাতিকে কাছে নিয়ে এখানেই থাকুন, জীবনের বাকী কয়টা দিন একটু স্ফূর্তি ক'রে কাটান।

—জীবনের বাকী কয়টা দিন বলছ কেন হে, চক্কোত্তি? ব্রজমোহন বাবুর এমন কি আর বয়স হয়েছে! আমাদের রসময়বাবু নব্বুই বছর পর্যন্ত কেমন সুস্থ-সমর্থ ছিলেন তুমি দেখনি?

—এই যে সুবিনয়, কেমন লাগছে নতুন এই পিতৃত্ব? আমরা ত পুরাতন পাপী, আমাদের এখন অবস্থা হয়েছে, ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। তবু গিন্নি ত বছরে বছরেই একটি উপহার নিয়ে আসছেন!

—তুমি এমন ভাবে কথা বলছ, বিমল, মনে হচ্ছে বৎসরের উপহারের জন্য একমাত্র তোমার গৃহিণীই দায়ী!

—আচ্ছা, আমাদের ডাক্তার অসীম রায়কে দেখছি না ত? সুবিনয়ের এই ছেলে প্রসব হবার সময় সেই নাকি ছিল অ্যাটেন্ডিং ফিজিসিয়ান! ভদ্রলোকের হাতের গুণ আছে কিন্তু বলতে হবে–সুবিনয়ের স্ত্রী এবং ছেলেকে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে নাকি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন।

–আপনি শোনেন নি, মিঃ ভট্টাচার্য, ডাঃ রায় কলকাতার চেম্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে এলাহাবাদে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছেন। বলছেন, কলকাতার আবহাওয়া নাকি তাঁর আর সহ্য হচ্ছে না!

ভারী দুঃখের কথা ত! আমরা একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ডাক্তারকে হারাব। কলকাতার ক্ষতি হবে এলাহাবাদের লাভ।

উৎসব ভাঙ্গিল রাত্রি প্রায় নয়টার সময়। অতিথি-অভ্যাগতগণ অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এবং আয়ার কোলে খোকাকে আবার একবার আদর

করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ড্রইং রুমের অতিরিক্ত বাতিগুলি একে একে নিভাইয়া দিয়া এবং ভুক্তাবশিষ্ট প্লেট-পেয়ালা সংগ্রহ করিয়া বেয়ারা বাহিরে চলিয়া গেল।

ব্রজমোহনবাবু রেবাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, খোকাকে আজ অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখা হয়েছে, নার্সকে ব'লে দাও, বৌমা, তাকে যেন এখনই ঘুমুতে নিয়ে যায়। আর আমিও অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছি, শুতে চল্‌লাম। আজ রাতে আর কিছু খাব না।

ব্রজমোহনবাবু তাঁহার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন, যাইবার পূর্বে নায়েব বিপ্রদাসবাবুকে বলিলেন, আপনিও আজ আর দেরি না ক'রে চ'লে যান নায়েবমশায়, এর পর ট্রাম বন্ধ হ'য়ে যাবে।

রেবা এতক্ষণ সুবিনয়কে এক মুহূর্তের জন্যও কাছে পায় নাই। এখন সে স্বামীর বক্ষসংলগ্ন হইয়া প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, সবাই বল্‌ছিল খোকার চেহারার সঙ্গে তোমার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা! আমি কিন্তু জানি কোথা থেকে এই সাদৃশ্য এসেছে!

কোথা থেকে?

আমার ভালবাসা থেকে। আমি যে তোমাকে সত্যিসত্যি ভালবাসি তারই নিঃসন্দেহ প্রমাণ হচ্ছে আমি আমার রক্তে বহন করেছি অবিকল তোমার মূর্তিকে। তুমি কিন্তু আমাকে এর এক-চতুর্থাংশও ভালবাস না!

—বাসি, রেবা, খুবই ভালবাসি। বলিয়া সুবিনয় রেবার ঠোঁটে একটি চুম্বন মুদ্রণ করিয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন চলিয়া গেল সেই নারীর প্রতি যাহার ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করিয়া তাহারা আজ করিতেছে এতখানি প্রদর্শন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইবে, তপতী হয়ত কোনদিনই তাহার দাবী, তাহার অধিকার জানাইবে না, কিন্তু সুবিনয় কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না এই মহিয়সী নারীর অপর্যাপ্ত বর্ষণ, যাহার নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে তাহাদের সমস্ত ভাবনা, যাহার সরসতা নৈরাশ্যের অপার মরুভূমিকেও রূপান্তরিত করিয়াছে সবুজ মরূদ্যানে।

সুবিনয় অতি সঙ্গোপনে ছোট্ট একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।